প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে

সাইফ তারিক

এক. অবতারণা

প্রজাপ্রতি দক্ষ বিশাল যজ্ঞ করছেন, এ সংবাদ পেয়ে কন্যা সতী সেখানে যেতে ইচ্ছা করলেন। বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছার কথা জানালে তাঁর স্বামী শিব কইলেন, এ যজ্ঞ তোমার জন্যও নয়, আমার জন্যও নয়। তোমার বাবা আমাকে তো নয়ই, তোমাকেও নেমন্তন্ন করেন নি। তাহলে যেচে কেন যাবে? সেটা কি শোভন হবে? মর্যাদাপূর্ণ হবে? জেনেছি, আমাকে এবং তোমাকে হেয় করাই তাঁর উদ্দেশ্য। ব্রহ্মযজ্ঞে ব্রহ্মা, তুমি এবং আমি ছাড়া সবাই উঠে দাঁড়িয়ে দক্ষকে সম্মান জানিয়েছিল। আমাদের জন্য তা আবশ্যক ছিল না; তারপরও তিনি ভাবলেন, তাঁকে আমরা হেয় করেছি। এখন তিনিও আমাদের হেয় করতে চান। অতএব বিনা নিমন্ত্রণে দক্ষালয়ে যাওয়া মোটেও উচিত হবে না। নিজেকে সংযত কর। ঘটনাপরম্পরা এবং উচিত-অনুচিত বিবেচনা করে শিব বারণ করলেন বটে, কিন্তু সতী তা মানতে নারাজ। তিনি কইলেন—

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন। যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন॥
শঙ্কর কহেন চটে যার ঘরে যাবে। নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম। আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা। বাপঘরে কন্যা যাবে নিমন্ত্রণ কিবা॥

সতী যতই বলেন, শিব অনুমোদন দিতে নারাজ। দাম্পত্য কলহ প্রকট হতে থাকল। কোনো যুক্তি, প্রবোধই সতীকে শান্ত করতে পারল না। শিব যতই যুক্তি দেন, তিনি তত ক্ষুব্ধ হন। এক পর্যায়ে তিনি শান্ত-সুবোধ আপনরূপ ছেড়ে যতসব বিকট-উৎকট রূপ ধারণ করতে লাগলেন।

যত কন সতী শিব না দেন আদেশ। ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ॥
মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা। শবারূঢ়া করকাঞ্চী শব কর্ণপুরা॥
গলিত রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে। গলিতরুধির মুণ্ড বাম করতলে॥
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশাণ। দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান॥
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে। ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট বিলাসে॥
দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ। তারা রূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবরণা লোলজিহ্বা করালবদনা। সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ এক জটাবিভূষণা॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল। ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীল পদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ড খর্পর। চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥
দেখি ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি। রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী॥

রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর। চারিহাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর॥
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ। পঞ্চপ্রেতনিরমিত বসিবার মঞ্চ॥
দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা। হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা॥
রক্তাবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ। পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারি ভুজ॥
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল। মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল॥
দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে। ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে॥
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমলআসনা। মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণভূষণা॥
অক্ষমালা পুথী বরাভয় চারি কর। ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর॥
দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত। ছিন্নমস্তা হইলা সতী অতি বিপরীত॥
বিকশিত পুণ্ডরীক কর্ণিকার মাজে। তিন গুণে ত্রিকোণমণ্ডল ভাল সাজে॥
বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি। কোকনদ বরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী॥
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে। খড়্গে কাটি নিজমুণ্ড ধরি করতলে॥
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার। একধারা নিজমুখে করেন আহার॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী। দুই ধারা পিয়ে তারা শব আরোহিণী॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন। অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন॥
দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন। ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন॥
অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন। কাকধ্বজরথারূঢ় ধূম্রের বরণ॥
বিস্তারবদনা কৃশ ক্ষুধায় আকুলা। এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা॥
ধূমাবতী দেখে ভীম সভয় হৈলা। হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা॥
রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিতা। পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণ ভূষিতা॥
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি। আর হস্তে মুদ্গর ধরিয়া উর্দ্ধ করি॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন। ললাটমণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন॥
দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া। পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া॥
রক্তপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি। চতুর্ভুজা খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি॥
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে। চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে॥
মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান। মহালক্ষ্মীরূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান॥

'অন্নদামঙ্গল'-এ ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ক্ষুব্ধ সতীর বিবিধ রূপধারণের এই বিবরণ দিয়েছেন। রূপ দেখে শিব ভয়ে তটস্থ, কম্পমান। এমন রূপ আগে কখনো দেখেন নি তিনি। প্রাণ-বাঁচাতে (বা মান-বাঁচাতে) এদিক ছোটেন, ওদিক ছোটেন। কিন্তু লাভ হয় না। তিনি যেদিকে যান, সতীও সেদিকে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়ান। দশ দিকে তিনি দশমূর্তি ধারণ করে শিবের গতি রুদ্ধ করেন। সতীকে আপন রূপে দেখতে না পেয়ে শিব দিশাহারা।

পলাইতে না পেয়ে ফাপর হৈলা হর। কহিতে লাগিলা কম্পমান কলেবর॥
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয়। কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয়॥

বিস্ময়ে অভিভূত, বিহ্বল শিব তাঁর প্রিয় স্ত্রীকে, প্রণয়িনীকে আপনরূপে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছেন। শেষ পর্যন্ত স্বামীর ব্যাকুলতা দেখে সতী আপনরূপে প্রত্যাবর্তন করলেন—

লুকাইয়া দশ মূর্ত্তি সতী হৈলা সতী। গৌরবর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীয় মূরতি॥

শিব বুঝলেন, একে ক্ষেপিয়ে লাভ নেই। দক্ষযজ্ঞে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি সতীকে বাপের বাড়ি যাওয়ার অনুমোদন দিলেন—

মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায়। যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায়॥
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীরে। রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে॥

দুই. দশমহাবিদ্যা : সতীর দশ রূপ

শিবের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে সতী যে দশ রূপ ধারণ করেছিলেন, সেগুলোর একত্রিত নাম দশমহাবিদ্যা। সতীই মহামায়া, মহাদেবী। দশমহাবিদ্যা হলো তার দশটি বিশেষ দেহরূপ। এ কথা তন্ত্রে বলা হয়েছে। মহাবিদ্যা কথার অর্থ মহান জ্ঞান। বিদ্যার আরেক অর্থ রূপ। এই দশমহাবিদ্যাকে বিষ্ণু তথা নারায়ণের দশ অবতারের নারীরূপও মনে করা হয়। পুরাণ অনুযায়ী সৃষ্টির প্রধান দশটি বিষয় মহাদেবীর এই দশ রূপের মাধ্যমে প্রকাশিত; একদিকে ভয়ঙ্করী রূপ, অন্যদিকে মোক্ষ ও অভয়দাত্রী রূপ। যে দশ রূপ ধারণ করেছিলেন সতী, সেগুলো হলো—

কালী : ব্রহ্মের চূড়ান্ত রূপ; দুঃখ-কষ্ট ও ভাবাবেগ দূর করে, সময় নিয়ন্ত্রণ করে। কৃষ্ণ অবতারের সম্ভাব্য নারীরূপ।

তারা : নীল সরস্বতী নামেও পরিচিত; শব্দ-শক্তি-সময়-বিবেক-বুদ্ধি ও বিবেচনার দেবী। মৎস্য অবতারের সম্ভাব্য নারীরূপ।

ষোড়শী : দেবী পার্বতীর তান্ত্রিক রূপ; আন্তরিক সৌন্দর্যের প্রতীক। ললিতা বা ত্রিপুরাসুন্দরী নামেও পরিচিত। পরশুরাম অবতারের সম্ভাব্য নারীরূপ।

ভৈরবী : প্রচণ্ডারূপা; তার মায়া ও ঐশ্বরিক শক্তি সব আদিম ক্ষমতাকে ধ্বংস করে। কল্কি অবতারের সম্ভাব্য নারীরূপ।

ভুবনেশ্বরী : জগৎ সৃষ্টিকারিণী দেবী, বিশ্বমাতা; তার বিস্তার অসীম। বামন অবতারের সম্ভাব্য নারীরূপ।

ছিন্নমস্তা : আপন মস্তক ছেদনকারী; এটি দেবীর ভয়ঙ্করতম ও প্রচণ্ডতম রূপ। নৃসিংহ অবতারের সম্ভাব্য নারীরূপ।

ধূমাবতী : নিজেকে বিধবা করে যে দেবী, বৈধব্য বা মৃত্যুর দেবী। এ রূপ অসম্পূর্ণতা, বিষণ্নতা, ক্ষতি, যন্ত্রণা প্রভৃতি নেতিবাচক দিক প্রকাশ করে। বরাহ অবতারের সম্ভাব্য নারীরূপ।

বগলামুখী : বাকশক্তির দেবী, মা কালীর হিংস্র রূপ; নিষিদ্ধ তন্ত্রের ভয়ংকর দেবী হিসেবেও পরিচিত। কূর্ম অবতারের সম্ভাব্য নারীরূপ।

মাতঙ্গী : তান্ত্রিক সরস্বতী; সংহত ও দৃঢ় চিন্তা গঠনের এবং সত্যোপলব্ধির ক্ষমতা দেয়। রাম অবতারের সম্ভাব্য নারীরূপ; এবং

কমলা : তান্ত্রিক লক্ষ্মী; তার ঐশ্বরিক প্রকৃতি, আলো, প্রেম ও সৌন্দর্য জড়জগৎকে উদ্ভাসিত করে। বুদ্ধ অবতারের সম্ভাব্য নারীরূপ।

যে ক্রমে সতী দশ রূপ ধারণ করেছিলেন সেই ক্রমের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তান্ত্রিকরা, বিশেষ করে বাংলা অঞ্চলের তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের দাবি সতী প্রথমে কালীরূপে শিবের সামনে হাজির হয়েছিলেন। ক্রম যা-ই হোক, দশটি রূপ তিনি ধরেছিলেন এটিই মূল কথা। সতীই প্রকৃতি। কিন্তু প্রকৃতিতত্ত্ব সহজবোধ্য বিষয় নয়, একে সহজবোধ্য করার জন্যই মহাবিদ্যাতত্ত্ব প্রবর্তন করা হয়। এই বিশ্বে প্রকৃতির তত্ত্ব যার মাধ্যমে জানা যায় তারই নাম দশমহাবিদ্যা; চির অবিজ্ঞাত জগৎসত্তার পূর্ণতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার উপায়।

উপনিষদে বলা হয়েছে, 'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্ধি মায়িনন্তু মহেশ্বরম'— অর্থাৎ মায়া প্রকৃতি, আর মায়ী মহেশ্বর। মায়া অঘটনঘটনকারিণী শক্তি। অঘটন ঘটানোর জন্য মায়া বিচিত্র কর্মকাণ্ড করে। এ কারণেই মায়াকে বলা হয় প্রকৃতি। প্রকৃতি মূলত দুই রকম— অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি গুণময়ী, ভূম্যাদিভাবে (ভূমি, প্রভৃতি রূপে) বিদ্যমান। আর পরাপ্রকৃতি জগৎ-বিধারিক, জীবভূত। আরো একরকমের প্রকৃতি আছে, যা শুদ্ধসত্ত্বময়ী অপ্রাকৃত। তার নাম যোগমায়া। এ প্রকৃতি মহেশ্বরের তথা শিবের অন্তরঙ্গ শক্তি; শিবের প্রাকৃত জগতে অপ্রাকৃত লীলা-খেলার আশ্রয়। মহেশ্বরের ঈক্ষণে (প্রত্যক্ষণে) সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়ী অপরা প্রকৃতি নিজের সাম্যাবস্থা ভেঙে বিশ্বজগতের জন্ম দেয়। প্রকৃতির এই বিচিত্র পরিচয় জানা-বোঝার প্রতীকী ব্যবস্থার নামই দশমহাবিদ্যা।

উল্লিখিত ক্রমে দশমহাবিদ্যার প্রথম বিদ্যা 'কালী', সর্বশেষ বিদ্যা 'কমলা'। তমোগুণের প্রভাবে যাদের অন্তর ঘোর তমসাচ্ছন্ন, আত্মশক্তি উমা (সতীর আরেক নাম) তাদের কাছে তমোময়ী। অখণ্ড-মণ্ডলাকার অন্ধকার (তমসাচ্ছন্নতা) আত্মশক্তি মায়ার প্রথম প্রকৃতি বা প্রকাশ। কালী বা মহাকালী হচ্ছে সতী বা মহাদেবীর উগ্ররূপ; কমলা তার সৌম্যরূপ। দশমহাবিদ্যা মহাদেবের তথা শিবের শক্তি; তার সিদ্ধি লাভের উপায়।

তিন. পুরুষ ও প্রকৃতি

পুরাণকথা বা ধর্মকথার বিবরণ দেওয়া এ লেখার উদ্দেশ্য নয়; শিবের তথা মহাদেবের এবং সতীর তথা মহাদেবীর কিচ্ছা সবিস্তারে উপস্থাপন করাও নয়। পুরাণকথা অনুযায়ী, মহাদেব হলেন পরমপুরুষ, আর মহাদেবী হলেন পরমাপ্রকৃতি। এই দুই সত্তাবিষয়ক আলোচনা ও বিবরণ থেকে জীবরূপ একক পুরুষ (নর) ও জীবরূপ একক প্রকৃতির (নারী) সম্পর্ক বোঝার প্রয়োজনেই পুরাণকথায়

আশ্রয় নিতে হয়েছে। পুরুষ ও প্রকৃতি ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় আলোচিত। তন্ত্রেও অলোচনা রয়েছে বিস্তর। ভারতীয় দর্শনের প্রসঙ্গ তোলা হলেও এ আলোচনার প্রাথমিক ভিত্তি সাংখ্য দর্শন।

প্রকৃতি জগতের আদি উপাদান ও অধিষ্ঠান— সাংখ্য দর্শন মনে করে, জগৎ প্রকৃতির পরিণাম মাত্র। জগতের আদি কারণ কোনো চৈতন্যস্বরূপ পুরুষ বা জড়-পরমাণু নয়। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ, সে জড়-জগতের কারণ হতে পারে না। আবার অপরিণামী জড়-পরমাণু থেকে অহংকারের (মন, বুদ্ধি) মতো সূক্ষ্ম তত্ত্ব জন্মাতে পারে না; তাই পরমাণু জগতের আদি কারণ নয়। জগতের আদি কারণ পরমাণুর চেয়েও সূক্ষ্ম পরিণামশীল এক জড়তত্ত্ব— ইহাই প্রকৃতি বা প্রধান বা অব্যক্ত। প্রকৃতি নিত্য, তার অভিব্যক্তিই জগৎ। প্রকৃতিতে জগৎ অব্যক্ত থাকে, তাই তাকে অব্যক্ত বলা হয়। প্রকৃতি নির্বিশেষ ও নিরবয়ব; তাই প্রত্যক্ষ নয় (উপলব্ধিযোগ্য নয়)। প্রকৃতি সর্বব্যাপী, অতিসূক্ষ্ম, অসীম ও জগতের আদিকারণরূপ জড়শক্তি। প্রকৃতিতেই জগতের স্থিতি ও লয়। কারণরূপ প্রকৃতি অব্যক্ত ও প্রধানরূপে এবং কার্যরূপ প্রকৃতি ব্যক্ত বা সৎরূপে প্রকাশিত।

প্রকৃতি তিন গুণের সমবায়; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— এই তার তিন গুণ। এ কারণে প্রকৃতিকে ত্রৈগুণ্য (ত্রিগুণসম্পন্না) বলা হয়। গুণ অনুযায়ী ও সহকারীভেদে একই প্রকৃতি নানা পরিণাম পায়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন তাদের আলাদা আলাদা পরিণাম হয়। সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে এবং তমঃ তমোরূপে পরিণত হয়। একে বলে প্রকৃতির স্বরূপ-পরিণাম বা সদৃশ-পরিণাম। সাম্যাবস্থা যখন বিনষ্ট হয়, তখন প্রকৃতিতে অন্যরকমের পরিণাম হয়; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের পারস্পরিক শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটে— কখনো সত্ত্ব, কখনো রজঃ, কখনো তমঃ গুণের প্রাধান্য দেখা দেয়। প্রকৃতির এমন পরিণামের নাম বিরূপ-পরিণাম বা বিসদৃশ-পরিণাম। বিরূপ পরিণামে জগতের সৃষ্টি এবং স্বরূপ পরিণামে জগতের লয়।

প্রকৃতির দুই অবস্থা— কার্যাবস্থা (ব্যক্ত) ও অকার্যাবস্থা (অব্যক্ত)। অকার্যাবস্থাকে বলা হয় মূলা-প্রকৃতি বা প্রধান। মূলা-প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা। যিনি প্রকৃষ্টরূপে কার্য উৎপন্ন করেন তিনিই প্রকৃতি; যা প্রকৃষ্ট কারণ, তা-ই প্রকৃতি। সাংখ্যমতে অন্যান্য কারণের তুলনায় উপাদান-কারণই প্রকৃষ্ট। সুতরাং এ জগতের যা উপাদান-কারণ তা-ই প্রকৃতি, সে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা। সূক্ষ্ম প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তার অস্তিত্ব যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মূলা-প্রকৃতির আরেক নাম প্রধান বা অব্যক্ত। অব্যক্ত প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। তবে প্রত্যক্ষ না হলেও তার অস্তিত্ব নেই, এ কথা বলা যায় না।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— এই তিন গুণ যথাক্রমে প্রীতি বা সুখ, অপ্রীতি বা দুঃখ এবং বিষাদ বা মোহের কারণ। জগতের যে কোনো পদার্থই হয় সুখ, না হয় দুঃখ, না হয় মোহের কারণ। প্রকৃতি সুখদুঃখমোহ-স্বরূপ। কার্য কারণগুণাত্মক অর্থাৎ কার্য কারণে নিহিত থাকে (যেমন কাপড়ের গুণ আসলে সুতার গুণ)। কার্য কারণগুণাত্মক বলেই অব্যক্ত বা প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকরা বলেন, ব্যক্ত থেকে ব্যক্ত উৎপন্ন হয়। পরমাণুগুলো ব্যক্ত। সেসব থেকে দ্ব্যণুক (দুই পরমাণুর সমবায়), পৃথিবী প্রভৃতি ব্যক্ত পদার্থের উৎপত্তি হয়। পৃথিবী প্রভৃতিতে

কারণের গুণানুসারে বিভিন্ন রূপেরও উৎপত্তি হয়। ব্যক্ত থেকে ব্যক্ত এবং তার গুণের উৎপত্তি সম্ভব হলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অব্যক্ত-এর কল্পনার কী দরকার? উত্তরে সাংখ্যাচার্যরা বলেন, ভেদাদি (অর্থাৎ তেইশটি মহৎতত্ত্ব অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তু) পরিমিত বা পরিমাণবিশিষ্ট হওয়ায়, বিভিন্ন কারণ ও কার্যের মধ্যে গুণবিচারে সমন্বয়ের উপস্থিতি বা সমতা থাকায়, শক্তি (বা কারণ) থেকে কার্যের উৎপত্তি হওয়ায়, সৃষ্টিকালে সব উৎপন্ন বস্তুতে কারণ ও কার্যের ভেদ থাকায় এবং প্রলয়কালে ওইরকম ভেদ না থাকায় সব বস্তুর অধিষ্ঠান হিসেবে অব্যক্ত প্রকৃতিকে স্বীকার করতে হয়।

কার্যবস্তু কারণে বিদ্যমান থাকলেও কারণ থেকে আবির্ভূত হয়ে ভিন্ন হয়। কার্যের তুলনায় কারণ সূক্ষ্ম ও ব্যাপক। মহৎ থেকে শুরু করে সব কার্যবস্তু কমবেশি ব্যক্ত ও স্থূল। মহৎতত্ত্ব পরিমিত অর্থাৎ তার পরিমাণ আছে, ফলে মহৎতত্ত্ব চরম অব্যক্ত নয়। পরিমিত বস্তুর উৎপত্তির উৎস (কারণ) অবশ্যস্বীকার্য। তাই মহৎতত্ত্বের কারণ হিসেবে পরম অব্যক্তকে স্বীকার করতে হয়। প্রকৃতিই পরম অব্যক্ত। জগৎ বৈচিত্র্যপূর্ণ, তবু জগতের বিচিত্র বস্তুর মধ্যে সমন্বয় রয়েছে। সমন্বয় মানে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সমরূপতা। পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূত, গন্ধ প্রভৃতি তন্মাত্র এবং মহৎ, অহংকার প্রভৃতি ভিন্ন হলেও এদের একটি সামান্যরূপ আছে। সেই রূপের নাম সুখদুঃখমোহ-স্বরূপতা। তাই সুখদুঃখমোহ-স্বরূপ অব্যক্ত কারণকে স্বীকার করতে হয়। তিন গুণে অন্বিত বিশেষ এই কারণই প্রকৃতি।

কারণের শক্তি থেকে কার্য উৎপন্ন হয়। কারণ শক্তিহীন হলে তার দ্বারা কার্য উৎপন্ন হয় না। শক্তিকে স্বীকার না করলে কোনো কার্যেরই উৎপত্তি সম্ভব নয়। জগতের সব প্রবৃত্তিই শক্তি-নিঃসৃত। শক্তি কোনো অতিরিক্ত পদার্থ নয়, কারণে স্থিত কার্যেরই অব্যক্ত অবস্থা। সৃষ্টির আগে জগৎ সৃষ্টিক্ষম এক অব্যক্ত কারণে সুপ্তাবস্থায় ছিল। যে অব্যক্ত শক্তির এই জগতের অধিষ্ঠান হওয়ার যোগ্যতা আছে তা-ই প্রকৃতি। কারণ ও কার্যের মধ্যে একই সঙ্গে ভেদ ও অভেদ বর্তমান। স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কার স্বর্ণ থেকে অভিন্ন, আবার আকৃতিপ্রাপ্ত অলংকার হিসেবে তা স্বর্ণ থেকে ভিন্ন। পরিণামপ্রাপ্ত জগতের সব বিষয়ের সঙ্গে যে উপাদান-কারণ একই সঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্ন রূপে বর্তমান, তা-ই প্রকৃতি। বিশ্বরূপ শব্দের অর্থ কার্যসমূহ। মাটি থেকে উৎপন্ন পদার্থ বিনষ্ট হলে তা মাটিতেই প্রবেশ করে এবং অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। তবে এ অব্যক্তাবস্থা আপেক্ষিক। প্রকৃতিই প্রকৃত অব্যক্ত। কারণ প্রকৃতি কখনো কোথাও প্রবিষ্ট বা তিরোভূত হয় না। উৎপত্তির আগে নিজের উপাদান-কারণে কার্যের বিদ্যমান থাকা এবং বিনাশের পর কার্যের নিজের উপাদান-কারণে লীন হওয়া— উভয়ই অব্যক্ত অবস্থা। অতএব, প্রলয়কালে বিশ্বরূপ যে অধিষ্ঠানে বিলীন হয় এবং যে অধিষ্ঠান থেকে বিশ্বরূপ সৃষ্টি হয়, সেই অধিষ্ঠানই প্রকৃতি।

সাংখ্য দর্শনে স্বীকৃত পঁচিশ তত্ত্বকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা প্রকৃতি, বিকৃতি, প্রকৃতি-বিকৃতি এবং নাপ্রকৃতি-নাবিকৃতি। পুরুষ চতুর্থ প্রকার তত্ত্ব। প্রকৃতি অর্থ কারণ, বিকৃতি অর্থ কার্য। পুরুষ কারণও নয়, কার্যও নয়। পুরুষ অপরিণামী অপরিবর্তনীয় সত্তা। পুরুষ প্রকৃতির পরিপূরক; প্রকৃতিতে যার অভাব, তা-ই পুরুষে বিদ্যমান। আবার প্রকৃতি যেসব ধর্মবিশিষ্ট, তার কোনোটির অভাব-অধিষ্ঠানই হলো পুরুষ। প্রকৃতি বৈচিত্র্যের বীজরূপ হলেও একটি বিশেষ ধর্ম তার নেই। সেটি হলো

চৈতন্য। চৈতন্য পুরুষের স্বরূপধর্ম। ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মতো সাংখ্যের পুরুষ শুধু চৈতন্যগুণসম্পন্ন দ্রব্য নয়; চৈতন্য পুরুষের আগন্তুক গুণ নয়। পুরুষ চৈতন্যময়। পুরুষ চিন্ময়সত্তা।

পুরুষ কালবন্ধনহীন, নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, পাপপুণ্যহীন ও স্বসম্মত। অন্যান্য দর্শনে যাকে সাধারণত আত্মা বলা হয়, সাংখ্য দর্শনে তাকেই পুরুষ বলা হয়। সাংখ্যকারিকায় প্রকৃতি বা প্রধান ও পুরুষের পৃথগ্নতা সম্পর্কে বলা হয়েছে— প্রকৃতি বা ব্যক্ত-এর ধর্ম হলো ত্রিগুণত্ব, অবিবেকিত্ব, বিষয়ত্ব, সামান্যত্ব, অচেতনত্ব, প্রসবধর্মিত্ব। অব্যক্ত প্রকৃতিও সেইরূপ। এসব গুণের কোনোটিই পুরুষে থাকে না। পুরুষ ব্যক্ত ও অব্যক্তের বিপরীত। অর্থাৎ পুরুষ অত্রিগুণ, বিবেকী, অবিষয়, অসামান্য, চেতন ও অপ্রসবধর্মী। পুরুষ নিত্যমুক্ত। তার বন্ধনও নেই, মোক্ষও হয় না। সে সাক্ষী ও দ্রষ্টা। চেতনই দ্রষ্টা হয়, অচেতন দ্রষ্টা হয় না। তবে পুরুষের ক্রিয়াশক্তি নেই অর্থাৎ সে নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতি যে রূপে তার সামনে নিজেকে উপস্থাপন করে, পুরুষ সেরূপ প্রকৃতিকে দর্শন করে মাত্র। ত্রিগুণের অভাবই কৈবল্য। কৈবল্য পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম। পুরুষ অত্রৈগুণ্য বা সুখদুঃখমোহ-রহিত, তাই সে নিরপেক্ষ (মধ্যস্থ)। সুখদুঃখ-রহিত যে তাকে উদাসীনও বলা হয়। প্রকৃতির রূপদর্শনে পুরুষ সাক্ষী হলেও স্বভাবত সে উদাসীন। আর বিবেকিত্ব এবং অপ্রসবধর্মিতার কারণে পুরুষ অকর্তা। পুরুষ-সংযোগের কারণে অচেতন মহদাদিকে চেতন মনে হয় এবং ত্রিগুণের কর্তৃত্ববশত উদাসীন পুরুষকে কর্তা মনে হয়।

পুরুষ সর্বব্যাপী এবং সংখ্যায় অনেক। অবিবেকবশত পুরুষ বদ্ধাবস্থাপ্রাপ্ত হয়। বদ্ধ পুরুষকে অবিবেকী বলা যায়। পুরুষের অবিবেক বিনাশ্য এবং এর বিনাশের মাধ্যমে পুরুষ মোক্ষ বা কৈবল্য লাভ করে। পুরুষের মুক্তি এবং প্রধানের (অব্যক্ত প্রকৃতি) ভোগের জন্য উভয়ের (পুরুষ ও প্রকৃতির) সংযোগ হয়, ফলে ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি হয়। স্বভাবসুলভ নিত্যমুক্ত উদাসীন দ্রষ্টা পুরুষের এই সংযোগ আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে। এ বিষয়ে 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী'তে বলা হয়েছে, প্রধানের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুরুষ প্রধানের দুঃখত্রয়কে নিজের বলে মনে করে এবং সেই দুঃখত্রয় থেকে মুক্তি কামনা করে, অর্থাৎ কৈবল্য আশা করে। কিন্তু পুরুষের বুদ্ধি ও বিভেদজ্ঞান (অন্যথাখ্যাতি) প্রধান ছাড়া হয় না। তাই কৈবল্যের জন্যও পুরুষকে প্রধান-এর জন্য অপেক্ষা করতে হয়। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ-পরম্পরা অনাদি।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণ তিনটি জড়। জড় স্বয়ং ক্রিয়াশীল হতে পারে না। তাই এসব জড়পদার্থের অধিষ্ঠানরূপে পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন। পুরুষ অধিষ্ঠাতা না হলে জড়পদার্থের পরিণাম নিয়মিতভাবে কখনোই হতো না। অধিষ্ঠাতা বলতে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধবিশেষকে বোঝায়। কিন্তু পুরুষ প্রকৃতি প্রভৃতির পরিণামের কর্তা নয়; পুরুষের সান্নিধ্যই এ পরিণামের কারণ। সক্রিয় হলেও অচেতন প্রকৃতি চেতন পুরুষের সান্নিধ্য ছাড়া বিশ্বসৃষ্টিতে অংশ নিতে পারে না। অতএব প্রকৃতির অধিষ্ঠানরূপে চেতন পুরুষকে স্বীকার করতে হয়।

সুখ, দুঃখ ও বিষাদ কোনো না কোনো কর্তার দ্বারা উপলব্ধ হয়ে থাকে। যে কোনো অভিজ্ঞতাই কোনো এক কর্তার অভিজ্ঞতা। জাগতিক বস্তুর অভিজ্ঞতা প্রকৃতি বা প্রকৃতির পরিণামী কোনো বস্তুর দ্বারা হতে

পারে না। কারণ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি ও তার পরিণামী সব বস্তুই জড় ও অচেতন। এ কারণে ব্যক্ত অব্যক্তকে এবং অব্যক্ত ব্যক্তকে ভোগ করতে পারে না। অতএব একজন ভোক্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন। ভোগ করার ক্ষমতা (সুখ, দুঃখ ও বিষাদের অনুভূতি) চেতন সত্তারই থাকে। সেই চেতন সত্তাই পুরুষ। সাংখ্য দর্শনে বস্তুজগৎ সম্বন্ধে চেতন সত্তার সর্ববিধ অভিজ্ঞতাই 'ভোগ'। পুরুষ শুধু সুখ-দুঃখের ভোক্তা নয়, প্রকৃতিভূত যাবতীয় বস্তুরই ভোক্তা এবং দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা। প্রকৃতিজাত যাবতীয় পদার্থই ভোগ্য, দৃশ্য ও জ্ঞেয়। প্রকৃতপক্ষে পুরুষ ভোক্তা নয়। কারণ ভোক্তৃত্ব কর্তৃত্বসাপেক্ষ। পুরুষ কর্তা হতে পারে না, যেহেতু সে নিষ্ক্রিয়। আবার প্রকৃতির ভোক্তৃত্বও স্বীকার করা যায় না, যেহেতু সে অচেতন। শুধু চেতনেরই ভোগ সম্ভব হয়। এ কারণে পুরুষের ভোক্তৃত্ব স্বীকার্য। পুরুষের এই ভোগ আরোপিত। কারণ পুরুষ স্বভাবত মুক্ত। প্রকৃত ভোক্তা বুদ্ধি বা অন্তঃকরণ। বুদ্ধি ও পুরুষ অভেদাত্মক বলে বুদ্ধির ভোগ পুরুষের বলে মনে হয়।

পুরুষ স্বভাবত সর্বব্যাপী হলেও শরীরবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়। সাংখ্যমতে পুরুষ বহু। জীবভাবাপন্ন অনেক পুরুষ পরস্পরের অবিরোধে অবস্থান করতে পারে, অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে পারে। শরীরে ভিন্ন হওয়ায় কোনো একজন পুরুষের সুখ-দুঃখ, শোক-সন্তাপ, জন্ম-মরণ প্রভৃতির অভিজ্ঞতা অন্য পুরুষের অনুরূপ অভিজ্ঞতার সহায়ক বা প্রতিবন্ধক হয় না। এ বিষয়ে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা প্রভৃতি সম্প্রদায় একমত। কেবল বেদান্ত সম্প্রদায় এ মতের বিরোধী। বেদান্ত মতে একই আত্মা উপাধিযুক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জীবে পরিণত হয়। জীব অসংখ্য, কিন্তু আত্মা এক। সাংখ্য মতে, পুরুষ যদি এক হতো, তাহলে একজনের জন্ম বা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলের জন্ম বা মৃত্যু হতো। একজনের অঙ্গহানি হলে অন্য সকলেরই অঙ্গহানি হতো। 'জন্ম' মানে পুরুষের উৎপত্তি এবং 'মরণ' মানে পুরুষের বিনাশ নয়। পুরুষ নিত্য। সুতরাং তার উৎপত্তিরূপ জন্ম বা বিনাশরূপ মৃত্যু নেই। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহংকার, বুদ্ধি ও সংস্কারের সঙ্গে পুরুষের সম্পর্কই জন্ম; এসবের থেকে বিযুক্তি তথা দেহাদি-পরিত্যাগই মৃত্যু। পুরুষের প্রবৃত্তি বিচিত্র। পুরুষের বহুত্ব স্বীকার না করলে তার প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করা যায় না। গুণের বিপর্যয়ের কারণে পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করতে হয়। বিপর্যয়ের অর্থ বৈচিত্র্য। সকল শরীরে একই আত্মা বিরাজিত থাকলে বিপর্যয় ঘটত না, বৈচিত্র্য থাকত না। সুতরাং স্বীকার করতে হয় যে, ভিন্ন ভিন্ন শরীরে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে।

চার. সৃষ্টি তথা জগতের অভিব্যক্তি

সাংখ্য দার্শনিকদের মতে জগৎ হলো প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি জগতের উৎপত্তির উপাদান-কারণ, অর্থাৎ জগৎ ও জগতের প্রত্যেক বস্তু ও বিষয়ের মূল কারণ। সৃষ্টির পূর্বে জগৎ প্রকৃতিতে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগের ফলে জগতের অভিব্যক্তি হয় অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি হয়। এই সংযোগ কীভাবে সম্ভব হয়? পুরুষ চেতন এবং অকর্তা। প্রকৃতি অচেতন এবং কর্তা। প্রকৃতি নিজেকে ভোগ করতে পারে না। আবার ভোক্তা না থাকলে ভোগ্য পদার্থের সার্থকতা নেই। ভোগের (অভিজ্ঞতার) প্রয়োজনে প্রকৃতিকে পুরুষের প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। পুরুষই তার সার্থকতা নিশ্চিত করে বলে সে পুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত হতে ইচ্ছুক হয়। কিন্তু পুরুষ অসঙ্গ ও উদাসীন, তাহলে প্রকৃতির সঙ্গে

তার সম্বন্ধ হবে কীভাবে? পুরুষ কৈবল্য বা মুক্তি চায়, এজন্য সে প্রকৃতির অপেক্ষা করে। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক— এই ত্রিবিধ দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তিকে কৈবল্য বা মুক্তি বলা হয়। পুরুষ নিত্যমুক্ত, তাহলে কৈবল্যের জন্য তার প্রকৃতির অপেক্ষা করার প্রয়োজন কী? উত্তরে বলা হয়, প্রকৃতি বা প্রধান পুরুষের ভোগ্য। পুরুষ প্রধান ও নিজের ভেদ বুঝতে অক্ষম। বুঝতে পারে না বলেই পুরুষ প্রকৃতি বা প্রধানের ত্রিবিধ দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করে। এ অবস্থা থেকে তার মুক্তি দরকার। এজন্য সে কৈবল্যলাভে ভীষণ আগ্রহী। সাংখ্যমতে, প্রকৃতি পুরুষের এবং পুরুষ প্রকৃতির অপেক্ষা করে। তাদের মধ্যে উপকারী-উপকৃত সম্বন্ধ রয়েছে। পুরুষ প্রকৃতির উপকার করে তাকে সার্থক করে; পাশাপাশি প্রকৃতির সুখ-দুঃখ ভোগ করে। প্রকৃতি তখন কৃতার্থ হয়। প্রকৃতিও পুরুষের উপকার করে। সে পুরুষকে সুখের চেয়ে দুঃখের অনুভূতি বেশি দেয়। ফলে পুরুষের কৈবল্যলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়। মহৎ থেকে পঞ্চমহাভূত পর্যন্ত সবই প্রকৃতি নিজের প্রয়োজনের মতোই পরের (পুরুষের) প্রয়োজনে সৃষ্টি করে। কৈবল্যকামী পুরুষের উপকারের জন্যই প্রকৃতি মহৎতত্ত্বরূপে পরিণত হয়। মহৎতত্ত্ব হলো প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এবং জগতের যাবতীয় বস্তুর বীজ।

প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগ ভোগ ও কৈবল্যের কারণ। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সংযোগ হলেই ভোগ ও কৈবল্য হয় না। প্রকৃতির পরিণামবশত বুদ্ধি বা মহৎ প্রভৃতি সৃষ্টি হলে তবেই ভোগ সম্ভব হয়। সুতরাং ভোগের জন্য মহৎ প্রভৃতির সৃষ্টি প্রয়োজন। তত্ত্বজ্ঞান বা পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ বিষয়ে জ্ঞান না হলে কৈবল্য হয় না। সুতরাং কৈবল্যের জন্যও মহৎ প্রভৃতির সৃষ্টি প্রয়োজন। অতএব স্বীকার করতে হয় যে, প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগের ফলে মহৎ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। বস্তুত প্রকৃতি ক্ষণকালও স্থির থাকে না; প্রতিক্ষণ তার পরিণতি ঘটছে। প্রলয়কালেও তার পরিণতি অব্যাহত থাকে। প্রলয়কালে প্রকৃতির তিনটি গুণের তারতম্য হয় না বলে ওই পরিণামের ফলে কোনো তত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। একে বলে স্বরূপ-পরিণাম। কিন্তু সৃষ্টিকালে অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগের সময় প্রকৃতি আলোড়িত হয়; তখন রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ গুণের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রথমে রজঃ সক্রিয় হয়, এর পরে সত্ত্ব ও তমঃ গুণের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রকৃতির তিনটি গুণের তারতম্যের জন্য যে পরিণাম হয়, তাকে বলে বিরূপ-পরিণাম। প্রকৃতির প্রথম বিরূপ-পরিণাম হলো মহৎতত্ত্ব। সৃষ্টির ক্রম হলো— প্রকৃতি থেকে মহৎ, মহৎ থেকে অহংকার, অহংকার থেকে বিকার (মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র— মোট ষোলোটি বিকার) এবং পঞ্চতন্মাত্র (বিকার) থেকে পঞ্চমহাভূত।

পাঁচ. তন্ত্র : শিব ও শক্তি

সাংখ্য দর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি তন্ত্রেও আলোচিত। সাংখ্য তন্ত্র-প্রসূত কি না সে প্রশ্নও তোলা যায়। সাংখ্য ধর্ম নয়, তন্ত্র ধর্মবিশেষ অথবা ধর্মের অতিরিক্ত কিছু। শৈব ও শাক্ত তন্ত্রে পুরুষের নাম শিব, প্রকৃতির নাম শক্তি। সব ধরনের শৈবমতেরই মূল কথা হলো চরম সত্তা বা পরম শিব একই সঙ্গে বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত। যিনি বিশ্বময় তিনি শক্তি, যিনি বিশ্বাতীত তিনি শিব। শিব ও শক্তি পৃথক সত্তা নয়, তারা অভিন্ন। শক্তি শিবের ঐশ্বর্য, হৃদয় ও সার। বিশ্বজগৎ চরম সত্তার সঙ্গে অভিন্ন সম্পর্কে বর্তমান। চরম সত্তা একই সঙ্গে স্থাণু ও গতিশীল, বিদ্যমান ও রূপান্তরী। গতিশীল দিকটি হচ্ছে শক্তি,

যিনি নিজের থেকেই নিজেকে বিশ্বজগৎরূপে ব্যক্ত করেন। সৃষ্টি তার উন্মেষ, প্রলয় তার নিমেষ— এটা চলছে পর্যায়ক্রমে। বৈষ্ণব ধর্মে পুরুষ কৃষ্ণ, প্রকৃতি রাধা। ভারতের প্রায় সকল ধর্ম ব্যবস্থাই কোনো না কোনোভাবে তন্ত্র-প্রভাবিত। সাংখ্যোক্ত ও তন্ত্রোক্ত পুরুষ-প্রকৃতির ধারণাই শিব ও শক্তির ধারণার উৎস। শৈব ও শাক্তধর্মের মূল পার্থক্য হলো প্রথমটিতে পুরুষ-প্রাধান্য, দ্বিতীয়টিতে প্রকৃতি-প্রাধান্য। ভারতে ধর্মচেতনার বিকাশের শুরু থেকেই বিকল্প লোকায়তিক জ্ঞান, কর্ম ও সাধনার ধারা হিসেবে তান্ত্রিক ধারা বর্তমান। এর বিকাশের প্রসঙ্গ ঋগ্বেদের কিছু অংশে, অথর্ববেদে এবং ব্রাহ্মণ সাহিত্যে দেখা যায়। বুদ্ধ এ ধারা থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁর দেহাত্মবাদ বা নৈরাত্ম্যবাদের ধারণা প্রাচীন তান্ত্রিক বিশ্ববীক্ষায় পাওয়া যায়। তন্ত্র অতিপ্রাচীন হলেও অধিকাংশ তান্ত্রিক গ্রন্থ মধ্যযুগে রচিত। সেসব গ্রন্থে নানা মতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অনেক ক্ষেত্রেই মূল বক্তব্যে রং চড়েছে। তান্ত্রিক ধারার অনুগামীরা এক পর্যায়ে বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন। তবে নিজেদের প্রাচীন জীবনচর্যা ও সাধনপদ্ধতিকে ধরে রেখেছিলেন এবং সংঘের মধ্যেই নানা গুহ্যসমাজ সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের প্রভাবে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব। তান্ত্রিক আদর্শ বৈষ্ণবধর্মকেও প্রভাবিত করেছিল, নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে রচিত লক্ষ্মীতন্ত্রে বলা হয়েছে, লক্ষ্মী বিষ্ণুর চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং সকল সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ।

তন্ত্র কথাটির অনেক অর্থ রয়েছে। শক্তিপূজার নিরিখে তন্ত্রের অন্যতম অর্থ ধর্মীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিয়মানুগ ব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ ধর্মাচার-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, কাঠামো প্রভৃতি। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (বৃহৎতন্ত্রসার) তন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে— সৃষ্টি ও প্রলয়-প্রকরণ, তন্ত্রনির্ণয়, দেবতাসংস্থান, তীর্থবর্ণন, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমধর্ম, ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কর্তব্যাকর্তব্য, প্রাণিসংস্থান, পুরাণকথন, কোষকথন, ব্রতবর্ণন, শৌচাশৌচ কথন, নরক বর্ণন, হরচক্র কথন, স্ত্রীপুরুষ লক্ষণ, রাজধর্ম, দানধর্ম, যুগধর্ম, ব্যবহার ও আত্মনির্ণয় ইত্যাদি বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত তাকে তন্ত্রশাস্ত্র বলা হয়।

বিশেষ অর্থানুযায়ী তন্ত্র বেদবিহিত ক্রিয়াদি থেকে পৃথক, এটাই বুঝতে হবে। বৈদিক যজ্ঞ, ক্রিয়ানুষ্ঠান, দেববিগ্রহপূজা প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্মাচরণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। লৌকিক দেব-দেবীর উপাসনার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসব দেবতাকে ঘিরে যেসব ধর্মাচার উদ্ভূত হয়েছে, সেগুলোকে অবৈদিক পর্যায়ে ফেলা হয়। এ বিচারে গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ইত্যাদি পূজাক্রমকে তান্ত্রিক পর্যায়ভুক্ত মনে করা যেতে পারে। সৌর ও গাণপত্য ধর্মসংক্রান্ত কোনো কোনো গ্রন্থ তন্ত্র নামে অভিহিত হতে পারে।

তন্ত্র-সাহিত্যের কোনো কোনো অংশের সঙ্গে ভারতীয় অনার্য ও তথাকথিত নীচু জাতের লোকদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। এমন মনে করার কারণ হলো, এগুলো অশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা এবং এগুলোর বিষয়বস্তু নিম্নস্তরের জাদুবিদ্যা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, ভেলকি বা নিম্নস্তরের জাদুবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন এসব তান্ত্রিক উপাসকের পরম লক্ষ্য ছিল। যারা ভেলকিতে কৃতকার্য হতেন তাদের নাথ বলা হতো। নাথপন্থীরা নীচু জাতের লোক ছিলেন। বিধিবদ্ধ শাস্ত্রের সঙ্গে, শাস্ত্রের ভাষার সঙ্গে তাদের সম্যক পরিচিতি ছিল না, এমনও হতে পারে তারা পরিচিত হতে খুব আগ্রহী ছিলেন না। এ কারণে তাদের লেখা তান্ত্রিক গ্রন্থগুলোর সংস্কৃত ভাষা অশুদ্ধ, ব্যাকরণবহির্ভূত ও দুর্বোধ্য। নাথপন্থীরা পূর্বভারতীয় তান্ত্রিক, তারা শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

শক্তি-সাধনের গুহ্য রহস্যমার্গ হলো তন্ত্র বা তান্ত্রিক-সাধনা। তন্ত্রশাস্ত্র বলতে সেইসব গ্রন্থকে বোঝায়, যেগুলোতে শক্তি-সাধনার পরিপ্রেক্ষিতে নানা দেবদেবীর ধারণা ও আচার-অনুষ্ঠানগত বিধিব্যবস্থা ও সেগুলোর প্রয়োগ আলোচিত হয়েছে। বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের পূজাক্রমে শক্তির বিশেষ ভূমিকা আছে, তাই সেগুলোও তান্ত্রিক পর্যায়ভুক্ত। তন্ত্র বিষয়ক আলোচনায় শক্তি-সাধনা বা এ বিষয়ক ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। আদিম যুগের মাতৃকাদেবীর উপাসনা এবং সংশ্লিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান শাক্তধর্মের উৎস। শক্তি-উপাসকদের আরাধ্যা দেবী সমরূপ অনেক দেবী বা ভিন্ন রূপের সমস্বভাবের দেবীদের সমন্বিত রূপ। এক বা একাধিক আদিরূপের সঙ্গে বহির্ভারতীয় অনেক প্রাচীন জাতির দেবীর মূল কল্পনার ঐক্যও ছিল। প্রাচীনকালে মাতৃকারূপে দেবীর পূজা শুধু যে ভারতে প্রচলিত ছিল তা নয়, পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং অন্যান্য স্থানেও প্রচলিত ছিল।

শাক্ত-তান্ত্রিক ভাবধারায় সর্বোচ্চ দেবতা একজন নারী, যিনি নানা নামে ও নানা রূপে কল্পিত। শাক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী স্বয়ং আদ্যাশক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রতীকস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেন। আদ্যাশক্তি বা শক্তিতত্ত্বের উৎস প্রাচীন যুগের মানুষের জীবনচর্যা। আদিম চেতনায় নারী শুধু উৎপাদনের প্রতীকই নয়, জীবনদায়িনীও বটে। জীবনদায়িনী মাতৃদেবীই ছিলেন ধর্মজীবনের কেন্দ্রবিন্দু। নারীশক্তির সঙ্গে প্রাকৃতিক ও মানবীয় ফলপ্রসূতার সমীকরণ থেকে সাংখ্য ও তন্ত্রোক্ত প্রকৃতি ধারণার উৎপত্তি। এ ধারণা থেকেই পরবর্তী কালের শক্তিতত্ত্বের উৎপত্তি ও বিকাশ। পৃথিবীর সর্বত্রই আদিম কৃষিজীবী কৌমসমাজে ধরণীর ফলোৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে নারীর সন্তান-উৎপাদিকা শক্তিকে অভিন্ন করে দেখার রীতি ছিল। সংস্পর্শ বা অনুকরণের দ্বারা একের প্রভাব অন্যের ওপর সঞ্চারিত করা সম্ভব— এ বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই আদি তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। তন্ত্রের দৃষ্টিতে প্রকৃতির রহস্য মানবদেহেরই রহস্য, মানবদেহই বিশ্বপ্রকৃতির সংক্ষিপ্তসার। মানবদেহ যন্ত্রবিশেষ, তার সাধনপ্রণালিই তন্ত্র।

বৌদ্ধতন্ত্রই হোক বা হিন্দুতন্ত্র, ভারতবর্ষের তন্ত্রসাধনা মূলত একটিই সাধনা। তান্ত্রিক ধারণাগুলো বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মিশে বৌদ্ধতন্ত্র এবং হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিশে হিন্দুতন্ত্রের রূপ ধারণ করেছে। বৌদ্ধ 'প্রজ্ঞা ও উপায়'-এর পরিকল্পনা ও তৎপ্রসূত সাধনা, আর হিন্দু 'শিব ও শক্তি'র পরিকল্পনা এবং তৎপ্রসূত সাধনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই। তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ দোঁহাকোষ ও চর্যাগীতির মধ্য দিয়ে সহজিয়া রূপ ধারণ করেছে। এর সাধনা বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায় এবং কিছু বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়। অন্তত দেড় হাজার বছর ধরে বাংলা অঞ্চলে এ ধারা প্রবহমান।

আদিতে শ্রী বা লক্ষ্মী এক দেবী ছিলেন না, তাঁদের সমীকরণ ঘটেছে মহাভারত ও রামায়ণে এবং পুরাণে। শাক্ত ভাবপুষ্ট বৈষ্ণবী বা লক্ষ্মীর শক্তি-উপাদান বৈদান্তিক বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরাও অস্বীকার করেন নি। রামানুজের শ্রীবৈষ্ণব ও মধ্ব সম্প্রদায় ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর শক্তি হিসেবে লক্ষীর উপাসনা করত। নিম্বার্ক, বল্লভ ও শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ের কাছে এই শক্তির নাম রাধা। রাধা-কৃষ্ণ মিলন বৌদ্ধ শূন্যতা ও করুণা অথবা প্রজ্ঞা ও উপায়ের মতোই স্ত্রী-পুরুষ মিলনের আদর্শায়িত প্রতীক। দক্ষিণ ভারতের বৈখানস সম্প্রদায় অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতো ব্রহ্ম, জীবাত্মা ও জড়জগৎ— এই ত্রিতত্ত্ব মেনেও

সবার উপরে বিষ্ণুর শক্তি হিসেবে শ্রী বা লক্ষ্মীকে স্থান দেয়। গুহ্যাতিগুহ্য তন্ত্রে বিষ্ণুর দশ অবতারের সঙ্গে শাক্ত দশমহাবিদ্যার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। পুরাণ অনুযায়ী সকল দেবীমূর্তিই শিবের সঙ্গে যুক্ত, শিবেরই বিভিন্নরূপ শক্তি; তবে তাদের স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল এবং সেভাবেই তারা পূজিত হতেন।

ছয়. শক্তি-সাধন : মন্দ্রচৈতন্য

তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনা গুরুবাদী, গুরুর ভূমিকা নিয়ামক। শক্তির উপাসকদের বলা হয় শাক্ত। তন্ত্রোক্ত উপাসনা বৈদিক উপাসনা থেকে ভিন্ন। তান্ত্রিক উপাসকেরা দেবতার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে মন্ত্রের দ্বারা তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন উপচারে অর্চনা করেন। এ উপাসনায় গুরু-শিষ্য-প্রণালি পরম প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় পবিত্র বিষয়। বলা যায় এটিই প্রথম পাঠ। ইষ্টদেবীর বীজমন্ত্র গুরুর মুখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুনে উপাসক দীক্ষিত হতেন। গুরু-নির্বাচন সহজ নয়। আবার গুরু আদর্শচ্যুত হলে তাকে ছেড়ে নতুন গুরু নির্বাচনের অধিকার শিষ্যের ছিল। যে-কেউ শিষ্য হওয়ার যোগ্য নয়। কীরকম উপাসক শিষ্য হওয়ার অধিকারী তা তন্ত্রশাস্ত্রে বলা আছে। তন্ত্রসার-এ গুরুকে সকলের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে। গুরুপূজা করলেই ইষ্টদেবতার পূজা সিদ্ধ হয়। গুরু স্বয়ং ঈশ্বর, শিব অথবা শক্তি। গুরু পরিচালক, তার যোগ্যতাই বিবেচ্য, জাত-কুল নয়। নারীরাও গুরু হতে পারেন। গুরুর কাছেই দীক্ষা নিতে হয়। দীক্ষা মানে পুনর্জন্ম।

দীক্ষাকালে শিষ্য গুরুর কাছ থেকে তার ইষ্টদেবতার পরিচায়ক বীজমন্ত্র পান। মন্ত্রগুলো গুহ্য এবং দুর্বোধ্য। মন্ত্র গোপন রাখার জন্যই এ দুর্বোধ্যতা আরোপ করা। তন্ত্রমতে যে বর্ণমালা দিয়ে শব্দ গঠিত হয়, তার প্রতিটি বর্ণই মাতৃকা হিসেবে কল্পিত। মন্ত্রের দু'রকম শক্তি— বাচক ও বাচ্য। প্রথমটি দ্বিতীয়টির স্বরূপ প্রকাশ করে। দ্বিতীয়টি জ্ঞাতব্য, প্রথমটি জানার পদ্ধতি। মন্ত্রের বাচক সত্তা বাক্যের দ্বারা গঠিত, বাক্য শব্দের দ্বারা, শব্দ ধ্বনির দ্বারা। ধ্বনির সূক্ষ্মতর ও সূক্ষতম পর্যায় দুটির নাম বিন্দু ও নাদ। ধ্বনির প্রকাশ হয় বর্ণে বা অক্ষরে, তাই বর্ণ বা অক্ষরই বীজ। বর্ণই ভাব ও রূপের স্রষ্টা ও তাদের থেকেই সিদ্ধ বীজমন্ত্রের জ্ঞান হয়। বিন্দু শিবের প্রতীক, নাদ শক্তির প্রতীক, আর বিন্দু ও নাদের মিলনে হয় শিব-শক্তি সামরস্য। সামরস্য হচ্ছে সেই দশা যে দশায় একে অপরের অঙ্গীভূত। শিব ও শক্তি অভিন্ন হলেও সৃষ্টিতে তাদের দ্বৈত ভূমিকা। শিব সৃষ্টির পুরুষ-আদর্শ, শক্তি স্ত্রী-আদর্শ। সৃষ্টিপদ্ধতি একটি চক্রের মতো, যেখানে অনুবর্তন চলছে। শক্তি উৎস থেকে নির্গত হয়ে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একটি চক্র সম্পূর্ণ করে আবার উৎসে ফিরে যায়। শাক্ত-তন্ত্র বলে, এ ধারা চলছে কল্পের পর কল্প।

মন্ত্রজপে সিদ্ধিলাভ করতে হলে মন্ত্রচৈতন্য করে এবং মন্ত্রার্থ সঠিকভাবে জেনে যথাবিধি জপ করতে হয়। মন্ত্র ও দেবতার অভেদজ্ঞানই মন্ত্রার্থ; মন্ত্রার্থ মানে শব্দার্থ নয়। মন্ত্রার্থ নির্ণয় করার পরে মন্ত্রচৈতন্য করাতে হয়। অচৈতন্য মন্ত্র বর্ণমাত্র; কোটিবার জপলেও ফল পাওয়া যায় না। জাপককে জপ্যমন্ত্র চৈতন্য করিয়ে দিতে হয়। মন্ত্রকে চৈতন্য করার অর্থ মন্ত্রকে চিৎশক্তিতে সমারূঢ় করা। অর্থাৎ বর্ণভাব বা অক্ষরভাব দূর করে মন্ত্রকে চেতন করা। মন্ত্র চিৎশক্তি-সমারূঢ় হলে তাকে সচেতন ও সজীব মন্ত্র বলা হয়। গুরুর কাছে সঙ্কেত ও ক্রিয়া সম্পর্কে জেনে মন্ত্রচৈতন্য করা শিখতে হয়।

যে সাধক শক্তির আরাধনা করেন, তিনি সাধনবলে মহাসিদ্ধি লাভ করেন। পঞ্চাচারক্রমে কুলশক্তির অর্চনা করতে হয়। যিনি কুলাচার অনুসারে সাধন করেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন। কুলাচারকে শুদ্ধাচারী তান্ত্রিকের কাছেও গোপন রাখতে হয়। বিন্দু (শিব) এবং নাদ (শক্তি)-এর মিলনই কামকলা (সৃষ্টি-পদ্ধতি, উৎপাদন-প্রক্রিয়া)। শিব সৃষ্টির পুরুষ-আদর্শ, আর শক্তি স্ত্রী-আদর্শ। এ ক্রিয়ায় শিব নিষ্ক্রিয়, শক্তি সক্রিয়। শক্তিবিহীন শিব শব মাত্র।

তান্ত্রিকেরা, বিশেষ করে বামাচারী (কুলাচারী) তান্ত্রিকেরা তাদের সাধনার মাধ্যমে দুটি রহস্যের অনুকরণ করেন। মূল বিষয়টিকে অনুধাবনের জন্যই অনুকরণের প্রয়োজন, মানুষ যা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই করে থাকে, শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই নয়। তান্ত্রিকেরা যে দুই রহস্যের অনুকরণ করেন তার প্রথমটি হলো শিব-শক্তির কামকলা (পুরুষ-প্রকৃতি সংযোগ) এবং দ্বিতীয়টি হলো শক্তির উৎসে প্রত্যাবর্তন বা ষট্‌চক্রভেদ। শক্তি অণুতে ও মহতে যুগপৎ বিরাজ করে এবং মানবদেহে কুণ্ডলিনীশক্তি রূপে মূলাধার চক্রে সুপ্ত থাকে। কুণ্ডলিনীশক্তিকে কায়-সাধনের দ্বারা জাগ্রত করে মূলাধার থেকে পর্যায়ক্রমে সহস্রারে উপনীত করাই সাধকের লক্ষ্য। কুণ্ডলিনীশক্তিকে সহস্রারে পাঠানোর অর্থ শক্তিকে তার উৎসে পৌঁছে দেওয়া। তাহলেই শিব-শক্তির সামরস্য (অভেদরূপ মিলন) ঘটে। শিব-শক্তির সংযোগই মৈথুন।

শক্তিই অনন্ত জগতের আদি কারণ, শক্তি সমস্ত তপস্যার মূল। শাক্তমতে, শক্তি-সাধনাতেই সাধকের সিদ্ধি। তান্ত্রিক মতের মূল চেতনা হলো, যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা-ই আছে দেহভাণ্ডে। এই দৃষ্টিভঙ্গি শাক্ত-ধারণার সাধনরূপ। গবেষকদের অভিমত : তন্ত্রসাধনায় যত গূঢ় রহস্যই থাকুক, এটি কোনো প্রাচীন উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাসের মাধ্যমে বিবর্তিত কামপ্রধান আচার। 'আধুনিক' দৃষ্টিভঙ্গির কারো কাছে তন্ত্র-সাধনা আপত্তিকর মনে হতে পারে। তবে সমাজবিকাশের যে-পর্যায়ে এর উদ্ভব হয়েছিল সেই পটভূমিতে দেখলে আপত্তি উত্থাপনের তেমন অবকাশ থাকবে না; তন্ত্রের তাৎপর্য বোঝাও সম্ভব হবে।

সাত. প্রকৃতি শক্তি দেবী : ধারণার বিবর্তন

ভারতীয় উপমহাদেশে অনার্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৃক্ষ-প্রতীকে দেবীপূজা প্রচলিত ছিল। এক সময় সারা পৃথিবীতেই বৃক্ষপূজা চালু ছিল, অনেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনো রয়েছে। বাংলার গ্রামাঞ্চলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এখনো এ বিশ্বাস কাজ করে যে, দেবীরা বৃক্ষে বাস করেন। দেবীস্থানগুলো বিশেষ বিশেষ বৃক্ষতলে অবস্থিত। মনসা গাছে দেবী মনসার পূজা বাংলায় প্রচলিত। বিল্ববৃক্ষ (বেলগাছ) দেবীর বাসস্থান— এ কথা শাস্ত্রকারগণ বলেছেন। দুর্গাপূজার সময় নবপত্রিকা পূজা হয়, এর মধ্যে বৃক্ষরূপিণী দেবীর পূজার প্রমাণ রয়েছে। নবপত্রিকা বলতে নয়টি গাছকে বোঝানো হয়। নবপত্রিকার নয়টি গাছ হলো কলা, ডালিম, ধান, হলুদ, মানকচু, সাধারণ কচু, বেল, অশোক ও জয়ন্তী। ধারণা করা হয়, শবর প্রভৃতি জাতির শস্য-উৎসব থেকে এ রীতি দুর্গাপূজার অঙ্গীভূত হয়েছে।

বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের আগে বাংলায় আদিম অধিবাসীদের ধর্মই চালু ছিল। মৃত্যুর পরও আত্মার বিরাজমানতায় বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, বিভিন্ন জাদুবিশ্বাস ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রাদি, মানুষ ও

প্রকৃতির সৃজনশক্তিকে মাতৃরূপে পূজা, গোষ্ঠী-প্রতীকের (টোটেম) প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং গ্রাম, নদী, বৃক্ষ, অরণ্য, পর্বত ও ভূমিতে নিহিত শক্তির পূজা, রোগ-বালাই-দুর্ঘটনায় দুষ্টশক্তি বা ভূতপ্রেতের ভূমিকা এবং বিবিধ নিষেধাজ্ঞা-জ্ঞাপক অনুশাসন নিয়েই প্রাক্-আর্যধর্ম গঠিত হয়েছিল। পরে এসব বিশ্বাস ও পূজাবিধি আর্যরা গ্রহণ করেছিল এবং সেগুলো হিন্দুধর্মে স্থান পেয়েছিল। ক্রমশ এসব বিষয় আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মে পরিণত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, দুর্গাপূজার নবপত্রিকার মতো নবান্ন, পৌষপার্বণ, হোলি, চড়ক, গাজন প্রভৃতি এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মকর্মে চাল, কলা, কলাগাছ, নারিকেল, সুপারি, পান, সিঁদুর, ঘট, আলপনা, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, গোময় ও পঞ্চগব্যের ব্যবহার প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে এসেছে। আটকৌড়ে, সুবচনীপূজা, শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠীপূজা, বিয়ের সময় গায়েহলুদ, পানখিলি, গুটিখেলা, স্ত্রী-আচার, লাজ বা খই ছড়ানো, দধিমঙ্গল, লক্ষ্মীপূজার সময় লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন প্রভৃতি আচার বাঙালি হিন্দু এখনো পালন করে। কিছু বিষয় অন্য ধর্মের অনুসারীরাও পালন করে। এসবই প্রাক্-আর্য সংস্কৃতি থেকে গৃহীত। ধ্বজাপূজা, বিভিন্ন যাত্রা-অনুষ্ঠান যেমন স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি এবং ধর্মঠাকুর, মনসা, শীতলা, জাঙ্গুলি, পর্ণশবরী প্রভৃতির পূজা ও অম্বুবাচী অরন্ধন— এসবও প্রাক্-আর্য সংস্কৃতি থেকে এসেছে।

পৃথক পৃথক শক্তি ও মহিমাকে কোনো এক সনাতনী দেবীর ধারণার মধ্যে একত্রিত করা ভারতীয় বা বাংলা পুরাণ-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে বলা হয়েছে, মহাশক্তি (মূল প্রকৃতি বা মূলা-প্রকৃতি) বিশ্ব উৎপন্ন করেন এবং তিনিই বিশ্বপ্রপঞ্চের সারভূত পরা-সত্তা। সাংখ্য দর্শনও এ ব্যাপারে একমত। বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলা হয়েছে, দেবী সর্বশক্তিমতী বিশ্বপ্রসবিনী। দেবীভাগবতে বলা হয়েছে, শক্তি সর্বভূতে আত্মারূপে বিদ্যমান। এ পুরাণ অনুসারে পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি অদ্বৈত। কারো কারো মতে, বৈদিক কবিদের মনেও মাতৃদেবীর রূপকল্পনা দেখা দিয়েছিল। অদিতি, ঊষা, সরস্বতী, পৃথিবী, রাত্রি, পুরন্ধি, ইড়া, ধীষণা প্রভৃতি দেবীর কথা তারা উল্লেখ করেছেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে কাত্যায়নী, কন্যাকুমারী ও দুর্গি বা দুর্গার উল্লেখ আছে। তিনটি সত্তাই (ধারণা) পৌরাণিক শক্তিপূজায় ব্যবহৃত হয়েছিল। মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে, দেবীর আরেক নাম কালী ও তার একরূপ করালী।

কাত্যায়নী আদিতে কাত্য উপজাতির দেবতা ছিলেন, এমনটিই ধারণা করা হয়। পরে নামটি শাক্ত দেবীর বিশেষণ হয়ে দাঁড়ায়। দুর্গা, উমা, গৌরী ও কালী পরবর্তীকালে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন এবং শাক্ত দেবীর সঙ্গে অভিন্না বলে ঘোষিত হয়েছেন। বৈদিক ও উত্তর-বৈদিক যুগে শক্তিপূজার সুগঠিত রূপ ছিল না, এর বিভিন্ন উপাদান ধীরে ধীরে সংগৃহীত হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে দেবীর উগ্ররূপের কথা বলা হয়েছে। দেবীর সৌম্যরূপও আছে। সৌম্যরূপের দেবীদের মধ্যে রয়েছেন পৃথিবী-দেবী, শ্রী, শাকম্ভরী, পার্বতী-উমা, সতী প্রভৃতি। বেদে পৃথিবী-দেবীর উল্লেখ রয়েছে। পৃথিবী-দেবী থেকেই সীতা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, শাকম্ভরী প্রভৃতি শস্যদেবীর উৎপত্তি। পুরাণে পৃথিবী শ্রী ও লক্ষ্মীর অপর নাম। কালিকাপুরাণ অনুযায়ী পৃথিবীই জগদ্ধাত্রী। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী দেবী শাকম্ভরী

অনাবৃষ্টির সময়ে আত্মদেহসমুদ্ভূত শাকাদির দ্বারা জগৎ প্রতিপালন করেন। শাকম্ভরীই অন্নদা বা অন্নপূর্ণা। পার্বতী পর্বতের দেবী, যার সঙ্গে পরে উমার নাম যুক্ত হয়েছে। পুরাণে উমা ঊন-উল্লিখিত, তবে তার উপস্থিতি বিশুদ্ধ সাহিত্যে রয়েছে। তিনি জগজ্জননী, তিনি শিবের পত্নী।

দুর্গা মূলত শস্যদেবী, তার সাক্ষ্য নবপত্রিকা। কালক্রমে তিনি দানব-দলনী হয়ে ওঠেন। দুর্গরক্ষার সঙ্গেও তার সম্পর্ক ছিল, যা তার দুর্গা নামের কারণ হতে পারে। চণ্ডিকা বা অম্বিকা, কখনো তিনি কৌশিকী নামেও পরিচিত। পার্বতীর কৃষ্ণবর্ণ দেহকোষ থেকে উদ্ভূত বলে তার নাম কৌশিকী। গবেষকদের মতে, ইনি কুশ বা কুশিক উপজাতির দেবী। কৌশিকী (কালী) তার দেহ থেকে নির্গত হলে পার্বতী নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হয়ে যান, এজন্য তিনি হিমালয়বাসিনী কালিকা নামে আখ্যাত। পরবর্তীকালে পুরাণ, উপপুরাণ এবং তন্ত্রে তার বিস্তার ও বিবর্তন হয়েছে, শিবের সঙ্গে তার সংযুক্তি ঘটেছে এবং তন্ত্রশাস্ত্রের তিনি প্রধান ও পরমতত্ত্ব হয়ে উঠেছেন।

মধ্যযুগ থেকে বাংলা অঞ্চলই তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনার প্রধানতম ক্ষেত্র। এ দেশে প্রচলিত বিষ্ণু ও শিবের উপাসনাতেও শক্তিপূজার বিশিষ্ট প্রভাব রয়েছে। উত্তর-মধ্যযুগের পরবর্তী কালীমূর্তি বাঙালি তান্ত্রিক সাধকের নিজস্ব পরিকল্পনা। বঙ্গীয় তান্ত্রিক সাধকের উপাস্য হিসেবে দেবীর এ উগ্ররূপ পরিকল্পিত হয়েছিল কমপক্ষে তিন শতাব্দী ধরে। বাংলা অঞ্চলের দুর্গাপূজা আসলে শস্যদেবীর পূজা। এটি অনুষ্ঠিত হয় তান্ত্রিক সর্বতোভদ্রমণ্ডল যন্ত্রে। দুর্গাকে উদ্ভিদের অধিষ্ঠাত্রীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল-এ বর্ণিত দেবীর অন্নপূর্ণা রূপ এবং কুলচূড়ামণি, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থে যে কুলবৃক্ষ পূজার উল্লেখ রয়েছে, তা দেবীর সঙ্গে উদ্ভিদ জগতের সম্পর্ককেই নির্দেশ করে। এ পূজা প্রাচীন কৌমসমাজের শস্য-প্রজনন-উৎসব ছিল। পুরাণ-উপপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রকে অবলম্বন করে যে মাতৃপূজাবিধি বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে তা দ্বাদশ শতকের আগে ব্যাপক ধর্মমত ছিল না। শাক্তধর্ম বাঙালির মধ্যে ব্যাপকতা পায় খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতকে।

মঙ্গলকাব্যের দেবীরা সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষের প্রাচীন মহাদেবীর প্রতিভূ নন, তারা স্থানীয় দেবী। চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীও অনেকাংশে লোকজ দেবী। প্রতিকূল বিদেশী রাজশক্তির কারণে উচ্চবর্গের ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখন বিপর্যস্ত তখন সমাজের নিম্নভাগ থেকে এসব দেবী মাথাচাড়া দিয়ে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা শুরু করেছিলেন, মঙ্গলকাব্যগুলোতে সে আখ্যানই বলা হয়েছে। যে ভক্তগোষ্ঠীর সহায়তায় দেবীদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রচারের চেষ্টা সেই ভক্তকুল চেষ্টা করেছিল সমাজের উপরতলায় নবাগতা দেবীদের প্রাচীন মহাদেবীর সঙ্গে যুক্ত করে ক্রমে অভিন্ন করে তুলতে।

কৃষিভিত্তিক বাংলা বা ভারতের সর্বত্র অসংখ্য বিভিন্ন মর্যাদার স্থানীয় মাতৃকাদেবী ছিলেন এবং আছেন। বিশ্বনিয়ন্ত্রিকা শক্তিরূপিণী মহাদেবীর একত্বের ধারণা বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান প্রধান আঞ্চলিক দেবীর সঙ্গে তার সমীকরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ওই উদ্দেশ্যেই নানা পৌরাণিক কাহিনির অবতারণা করা হয়। দক্ষযজ্ঞের কাহিনি এ প্রয়াসের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এ কাহিনি অনুযায়ী, পিতা দক্ষের মুখে পতিনিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেন। এ খবর পেয়ে স্বামী শিব উন্মত্তপ্রায়। তিনি সতীর মৃতদেহ কাঁধে করে পৃথিবী ভ্রমণ করতে থাকলে বিষ্ণু সুদর্শনচক্র দিয়ে সতীর

দেহ খণ্ডিত করেন। যেসব স্থানে সতীর দেহাংশ পড়েছিল, সেসব স্থানে শাক্তপীঠ গড়ে ওঠে। শিব ভৈরব-রূপ ধারণ করে বিভিন্ন পীঠে সতীর দেহাংশ রক্ষা করেন। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা ছিলেন আঞ্চলিক দেবী। শাক্ত মহাদেবীর সঙ্গে তাদের সম্পর্কিত করার জন্যই দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, তার দেহের খণ্ডীকরণ ও খণ্ডিত অংশগুলো যেখানে যেখানে পড়েছিল, সেসব স্থানে শাক্তপীঠ গড়ে ওঠার কাহিনি জুড়ে দেওয়া হয়। শাক্তপীঠ একান্নটি, উপপীঠসহ হিসেব করলে সংখ্যা আরো বেশি। বিভিন্ন পুরাণে দেবীর ১০৮ নাম ও রূপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দেবীর সহস্র নাম ও রূপভেদের উল্লেখ রয়েছে।

বাংলা অঞ্চলে তন্ত্রসাধনার প্রচলন ও প্রভাব অনেক আগে থেকেই। বাংলা ও সংলগ্ন পূর্বভারতীয় অঞ্চলগুলোতে অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তন্ত্র গভীর প্রভাব বিস্তার করে মহাযান বৌদ্ধধর্মকে বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করেছিল। বাংলাদেশে যত হিন্দুতন্ত্র প্রচলিত আছে সেগুলো মোটামুটিভাবে দ্বাদশ শতক থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত। তন্ত্রের মধ্যে দার্শনিক মতবাদগুলো বড়ো বিষয় নয়, বড়ো বিষয় হলো দেহকে যন্ত্র গণ্য করে গুহ্য সাধনপদ্ধতি। তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ দোঁহাকোষ এবং চর্যাগীতির মধ্য দিয়ে সহজিয়া রূপ ধারণ করেছে। বাংলার বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে এ রূপ দেখা যায়।

বাংলা অঞ্চলের মাতৃদেবী বহু যুগের বহু ধারার সমন্বিত রূপ। দেবীর প্রাচীন ধারা মূলত দুটি : একটি শস্যপ্রজননী ও ভূতধারিণী পৃথিবী দেবীর ধারা, অন্যটি পর্বতবাসিনী সিংহবাহিনী দেবীর ধারা। সিংহবাহিনী দেবী পরে পার্বতী, গিরিজা, অদ্রিজা বা অদ্রিকুমারী, শৈলতনয়া প্রভৃতি নামে খ্যাত হন। পার্বতীই উমা। মাতৃকাদেবীরা ছিলেন স্থানীয় দেবী; তারা মূলত মাতৃত্ব ও প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার প্রতীক। পরে তারা বিভিন্ন দেবতার শক্তি হিসেবে কল্পিত হয়েছেন। কোনো কোনো মাতৃকার সঙ্গে খোদ শাক্ত মহাদেবীর সমীকরণ হয়েছে। শক্তির এরূপ একীকরণ ও সমন্বয়ের প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেব-বন্দনায় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের (বিশেষত রাঢ়) প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবীর উল্লেখ রয়েছে।

আট. প্রকৃতি-কৃষি-ফসল সম্পর্ক

বেদপূর্ব সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম ছিল মাতৃপ্রধান, বৈদিক ধর্ম পুরুষপ্রধান। পরবর্তী কালের ভারতীয় ধর্মে অন্তত সাধারণ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে ঋগ্বেদের প্রাচীন পুরুষ-দেবতাদের বিশেষ পরিচয় মিলে না। এ ধর্মবিশ্বাসের প্রধানতম উপাদান মাতৃপূজা। সিন্ধু-সভ্যতার ধর্মের সূত্র এতে রয়ে গেছে কি না সে প্রশ্ন তোলাই যায়। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্য পর্বে দেবী নিজেই বলছেন, 'অনন্তর বর্ষাকালে আত্মদেহ-সমুদ্ভূত প্রাণধারক শাকের সাহায্যে আমি সমগ্র জগতের পুষ্টি-সরবরাহ করব; তখন আমি জগতে শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হব।' শাকম্ভরী নামের মধ্যেই স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে, শাক-জাতীয় উদ্ভিদ দেবীর গর্ভপ্রসূত। তিনি বসুমাতা, পৃথিবী। শাক বলতে লতা, পাতা, মূল ইত্যাদি দশরকমের বস্তুকে বোঝায়। লক্ষ্মীতন্ত্রে শাকম্ভরী দেবীর সঙ্গে উমা, দুর্গা, পার্বতী, চণ্ডী, সতী ও

কালিকেশা দেবীকে সমীকৃত করা হয়েছে। যে প্রাচীন বিশ্বাস থেকে শাকম্ভরী নামের উদ্ভব হয়েছিল, তার একটি নিদর্শন হরপ্পার ধ্বংসস্তূপে খুঁজে পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। একটি সিল পাওয়া গেছে, যার এক পিঠে উত্তানপদ দেবীমূর্তি রয়েছে। তাতে দেবীর গর্ভ থেকে উদ্ভিদের উদ্ভবের চিত্র রয়েছে। এর থেকে অনুমান করা হয়, শাকম্ভরী দেবী পুরাণের চেয়েও অনেক পুরোনো। সিন্ধু-যুগে তার পরিচয় স্পষ্ট ছিল। সিন্ধু-সভ্যতায় দেবীর সঙ্গে উদ্ভিদ জগতের সম্পর্কের ইঙ্গিত এই সিলটির মধ্যেই আবদ্ধ নয়, আরো অনেক সিলে দেবীকে উদ্ভিদ-পরিবৃতা বা উদ্ভিদ-অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এসব নজির থেকে অনুমান করা হয়, সিন্ধু-সভ্যতায় বৃক্ষ-উপাসনা প্রচলিত ছিল। পরবর্তী ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসেও বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে দেবীকেই কল্পনা করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে দেবী অদিতির বর্ণনাতেও 'উত্তানপদ' শব্দ ও ধারণা ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, দেবোৎপত্তির আগে অবিদ্যমান থেকে বিদ্যমান (অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত!) বস্তু উৎপন্ন হলো। পরে উত্তানপদ (মানে তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষ) থেকে দিক-সকল জন্মগ্রহণ করল। এ কথাও বলা হয়েছে, উত্তানপদ থেকে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী থেকে দিক-সকল জন্মিল, অদিতি থেকে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ থেকে আবার অদিতি জন্মিলেন। বেদের চেয়েও অন্তত হাজার বছরের পুরোনো সিন্ধুধর্মীয় কৃষিভিত্তিক উত্তানপদ-ধারণার কথা ঋগ্বেদে উল্লিখিত থাকার এমন ব্যাখ্যা হতে পারে যে, আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর স্থায়ী হয়ে যাওয়া আর্যরা ধীরে ধীরে নিজেদের কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। অবশ্য তারা তাদের পুরুষপ্রাধান্য বজায় রেখেছিল।

সিন্ধু-সভ্যতার বৃক্ষ-উপাসনাকে শক্তি-সাধনার সঙ্গে সম্পর্কিত করা যায় কি? উদ্ভিদ-অধিষ্ঠাত্রী বা শস্যদেবীর উপাসনা শক্তি-সাধনার বিশেষ অঙ্গ। যার নাম শাকম্ভরী তারই নাম দুর্গা। ফসলের মৌসুমেই দুর্গোৎসবের আয়োজন হয়। দুর্গাপূজায় অর্থাৎ পরবর্তীকালের ভারতীয় ধর্মেও দেবীর সঙ্গে উদ্ভিদ-জগতের স্পষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। এ কারণেই শাক্তরা ভোরে কুলবৃক্ষ বা কুলতরুকে প্রণাম করেন। আদি-পর্যায়ে শক্তি বা দুর্গা শস্যদেবী হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছিলেন বলেই তার আরেক নাম অন্নদা বা অন্নপূর্ণা। বৃক্ষ-উপাসনাকে সিন্ধুধর্মের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য না ভেবে বরং একথা অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রাচীনকাল থেকে বৃক্ষ-উপাসনা শাক্তধর্মের প্রধানতম উপাদান।

শক্তি-সাধনা বা মাতৃ-উপাসনার সঙ্গে শস্য বা উদ্ভিদ জগতের এ জাতীয় সম্পর্ক কেন? নৃতত্ত্ববিদেরা বলেন, পৃথিবী বা প্রকৃতির ফলপ্রসূতামূলক কামনা থেকেই বসুমাতা বা আদ্যাশক্তি বা জগদম্বা কল্পনার উদ্ভব। বসুমাতা-কল্পনার উৎসে রয়েছে এক আদিম বিশ্বাস। ওই বিশ্বাসে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা ও মানবীয় ফলপ্রসূতা সমার্থক। শস্যদায়িনী প্রকৃতি সন্তানদায়িনী মায়ের অনুরূপ। অতএব প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা মানবীয় প্রজননের অনুকরণের সঙ্গে যুক্ত। এ বিশ্বাসের নাম 'ফার্টিলিটি ম্যাজিক' বা উর্বরতামূলক জাদুবিশ্বাস। দেশে-দেশান্তরে এ বিশ্বাস-কেন্দ্রিক বহুবিধ আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, এখনো অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে। বাংলার সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতার ঘনিষ্ঠতার কথা বলা হয় ধান্যশস্যের ব্যবহারের নিরিখে। চাল বাঙালির প্রিয় ও প্রধান খাদ্য। এর চাষ বঙ্গোপসাগরের আশপাশের কোথাও শুরু হয়েছিল। বাংলাই মাতৃদেবীর পূজার লীলাকেন্দ্র। এ পূজার উদ্ভব নবোপলীয়

যুগে, কৃষির সূচনার সঙ্গে। বাংলায় নবোপলীয় বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল ধানের চাষ নিয়ে। ধানের চাষের সঙ্গে মাতৃদেবীর পূজা বাংলাতেই শুরু হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। ধান্যশস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী। লক্ষ্মীপূজার আরেক নাম খন্দপূজা। খন্দ অর্থ হচ্ছে ফসলাদি। লক্ষ্মীপূজা যে অতি প্রাচীনকাল থেকে অনুসৃত হয়ে আসছে, তা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি থেকে বোঝা যায়। সূচনায় মাতৃদেবীর পূজা যে ফসলাদির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল তা হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি সিলে খোদিত নারীমূর্তি থেকে স্পষ্ট হয়। এই নারীমূর্তির জননদ্বার থেকে নির্গত হয়েছে পল্লবিত ছোট চারা-গাছ, লতা-পাতা, গুল্ম প্রভৃতি।

দেবীকে আহ্বান করতে হয় যন্ত্রে ও ঘটে। 'যন্ত্র' তন্ত্র-সাধনার অবিচ্ছেদ্য উপাদান। তন্ত্রে বলা হয়েছে, যন্ত্র ছাড়া পূজা করলে দেবতা সন্তুষ্ট হন না। তন্ত্রবিদদের মতে, যন্ত্র শুধু দেবীর প্রতীক নয়, তা শক্তিলেখও বটে। অগ্রসর সাধকের জন্যেই যন্ত্রপূজা। প্রত্যেক দেবীর আলাদা আলাদা যন্ত্র রয়েছে, তবে ভূপুর ও পদ্ম সকল যন্ত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তন্ত্র ও পুরাণমতে পদ্ম হলো সৃষ্টির প্রতীক। যন্ত্রগুলো নারী-জননাঙ্গের প্রতীকচিত্র। নারী-জননাঙ্গের চিত্র আঁকার পিছনেও এক আদিম বিশ্বাসের প্রভাব রয়েছে। বিশ্বাসটি হলো, নারী-জননাঙ্গের ওপর প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতা নির্ভরশীল। দুর্গাপূজা যে যন্ত্রে করা হয় তার নাম সর্বতোভদ্রমণ্ডল। এটি তন্ত্রের একটি বিখ্যাত যন্ত্র। সর্বতোভদ্রমণ্ডল-এর মূল বিষয়বস্তু হলো অষ্টদলপদ্ম ও বীথিকা। প্রায় সব তান্ত্রিক যন্ত্রেরই মূল বিষয়বস্তু পদ্ম ও বীথিকা। পদ্ম বা অষ্টদলপদ্ম নারী-জননাঙ্গের প্রতীক। অনেক তান্ত্রিক রচনায় পদ্ম শব্দটিকে সোজাসুজি এই অর্থেই গ্রহণ করা হয়েছে; বলা হয়েছে, পদ্মমধ্যে শুক্রের মিলনে সন্ততির জন্ম। বজ্র বা মণি পুরুষ-অঙ্গবাচক, আর পদ্ম হলো ভগ বা নারী-জননাঙ্গবাচক। তান্ত্রিক যন্ত্রগুলোতে পদ্মকে ঘিরে থাকে বীথিকা। নারী-জননাঙ্গের সঙ্গে বীথিকার সম্পর্ক কী? এর মূলেও আছে এক আদিম বিশ্বাস, যে বিশ্বাস থেকে দেবীর নাম হয়েছিল শাকম্ভরী। প্রাকৃতিক উর্বরতার সঙ্গে মানবীর উর্বরতার সংযোগ কল্পনা করা হয়েছে বলেই তন্ত্রে নারী-জননাঙ্গকে উদ্ভিদবাচক নাম (লতা) দেওয়া হয়েছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ফুলকেই যন্ত্র হিসেবে ধরে নিয়ে তার ওপর দেবীপূজার বিধান দেওয়া হয়েছে। জগজ্জননীর পূজার আধার এসব ফুল। এ ফুলগুলোকে বলা হয় যন্ত্রপুষ্প (অপরাজিতা, জবা, শ্বেতকরবী, রক্তকরবী ও দ্রোণপুষ্প)। এগুলোতে চণ্ডিকাদেবী বাস করেন। তন্ত্র-সাহিত্যে 'লতা' শব্দের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। 'লতা' শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো নারী-জননাঙ্গ। তন্ত্র-সাধনায় অন্যান্য গুহ্যসাধনার মতো আরেকটি গুহ্য ও কঠিন সাধনার নাম লতাসাধনা।

সর্বতোভদ্রমণ্ডলের অর্থও নারী-জননাঙ্গ। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, এ মণ্ডলের উপর ঘট স্থাপন, ঘটের গায়ে সিন্দুরপুত্তলি আঁকা মানবীয় প্রজননের প্রায় একটি পূর্ণাঙ্গ নকল তোলার আয়োজন। নারী-জননাঙ্গের তান্ত্রিক নাম লতা, তান্ত্রিক যন্ত্রে অষ্টদলপদ্মকে ঘিরে থাকে বীথিকা। এটি নারী অঙ্গের জননশক্তির স্পর্শে প্রকৃতিকে ফলপ্রসূ করার কল্পনা। যন্ত্র আর ঘট দুর্গাপূজার প্রধানতম অঙ্গ। তার মানে, কৃষি-আবিষ্কার পর্যায়ের এক আদিম বিশ্বাসই এ-পূজার কেন্দ্রীয় বিষয়। আদিপর্বে দুর্গাপূজা পূজাই ছিল না; ছিল জাদু-অনুষ্ঠান। জাদু-অনুষ্ঠানের মূলে রয়েছে কামনা সফল করার চেষ্টা। তবে

প্রার্থনা-উপাসনার সাহায্যে ঈশ্বরের করুণা উদ্রেক করে নয়; তার বদলে, কামনা সফল হওয়ার একটা নকল তুলে তার সাহায্যে কামনাটিকে সফল করার কল্পনা।

উত্তর আমেরিকায় ফসলে পোকা ধরলে ঋতুমতী মেয়েরা রাতে নগ্ন হয়ে ক্ষেতের ওপর হাঁটত। ইউরোপের চাষিদের মধ্যেও এ প্রথা ছিল। কিছুদিন আগেও এ প্রথা বর্তমান ছিল, এখনো রয়েছে কোথাও। খারাপ পোকার প্রতিষেধক হিসেবে প্লিনি ব্যবস্থা দিয়েছিলেন, ঋতুমতী মেয়েরা খালি পায়ে এলোচুলে কোমরের উপর পর্যন্ত কাপড় তুলে ক্ষেতের ওপর হাঁটবে। নারীদেহে যে উর্বরাশক্তির আবির্ভাব হয় তা ক্ষেতের মধ্যে সঞ্চারিত হবে, এমন বিশ্বাস থেকেই এ বিধান ও আচরণ। জুলুদের মধ্যে প্রথা হলো, ক্ষেতে ঘুরবার সময় মেয়েরা নগ্ন হবে, ঋতুমতী যে হতেই হবে তা নয়। মেয়েদের জননাঙ্গ প্রদর্শন-মূলক অনুষ্ঠানাদির বিশ্বাসের উৎস দুনিয়াজুড়ে একই। গ্রিসে এ অনুষ্ঠান বিশেষভাবে দিমিতর-দেবীর সঙ্গে যুক্ত। নানান গ্রিক পূজাপদ্ধতিতে পূজারিণীরা খালি পায়ে আর এলোচুলে সার বেঁধে হাঁটবে বলে উল্লেখ রয়েছে। নারী জননাঙ্গকেই মানুষ এককালে উৎপাদনশক্তির আধার মনে করেছে, তাই প্রাকৃতিক উৎপাদনে সংকট দেখা দিলে মেয়েরা নগ্নতার সাহায্যে তা দূর করতে চেয়েছে।

সিন্ধু-সভ্যতার নানা চিত্রলিপি এবং অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে পরবর্তীকালে তন্ত্রসাধনায় ব্যবহৃত চিত্রাবলির উৎস-নির্দেশনা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এমন কিছু মাতৃমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলো তৈরিতে নারী-জননাঙ্গের উপরই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা করা হয়েছে। মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তূপ থেকে পাওয়া পোড়ামাটির যোনিমূর্তি এর প্রমাণ। তন্ত্রসাধনায় যন্ত্র হিসেবে প্রচলিত চিত্রগুলোর সঙ্গে এই মূর্তির নিম্নভাগের সাদৃশ্য রয়েছে বলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের অভিমত। তন্ত্রের যন্ত্রগুলো আর কিছু নয়, নারী-জননাঙ্গের প্রতীক-চিহ্নমাত্র। নারীর প্রকৃতিসম উৎপাদিকা শক্তিতে বিশ্বাসের আদিম ধারার অনুসরণেই এসব যন্ত্র প্রণীত। প্রাচীন এ বিশ্বাসের পিছনে রয়েছে প্রজননের আকাঙ্ক্ষা। শুধু প্রজননের কামনাই নয়, তার সঙ্গে জড়িত ছিল ধনোৎপাদনের কামনা এবং কৃষিকাজের সাফল্য-কামনাও। মানবসমাজের ওই স্তরে বিশ্বাস করা হতো, শুধু সন্তান-উৎপাদনই নয়, প্রাকৃতিক উৎপাদনও নারী-জননাঙ্গের ওপর নির্ভরশীল।

এমন বিশ্বাসের স্মারক সিন্ধু-সভ্যতার মধ্যেই পরিসমাপ্ত নয়, উত্তরকালের তন্ত্রসাধনার মধ্যে তার অবিচ্ছেদ্য প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রাকৃতিক উৎপাদনের সঙ্গে মানবীয় উৎপাদনের সমরূপতা এবং নারীর নিয়ামক ভূমিকাই উর্বরতা-কেন্দ্রিক প্রাচীন জাদুবিশ্বাসের ভিত্তি। শাক্ত দর্শনের মূল ভিত্তি সাংখ্য দর্শন, যা গড়ে উঠেছিল প্রাচীনযুগের তন্ত্র থেকে উদ্ভূত প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বকে আশ্রয় করে। তান্ত্রিক পুথিগুলোর চেয়ে তন্ত্র অনেক বেশি প্রাচীন, যার মূল খুঁজতে বৈদিক যুগেরও অনেক পেছনে যেতে হবে। প্রাচীন মাতৃপ্রধান সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছে প্রকৃতিপ্রাধান্যবাদ। মাতৃকাদেবী-কেন্দ্রিক সেই প্রাচীন জীবনচর্যাই আদিতন্ত্র। পরবর্তীকালে সাংখ্য দর্শন সেটিকে অবলম্বন করেছিল। তারও পরে মাতৃপ্রধান বা প্রকৃতিপ্রধান ধর্মব্যবস্থার আবেদন ছিল মূলত সমাজের নিম্নস্তরে, বিশেষ করে কৃষিজীবী মানুষদের মধ্যে। এ বিশ্বাস সাধারণ মানুষের জীবনে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। সেই প্রভাবের ব্যাপ্তি এত বেশি ছিল যে, ভারতের বাকি সব গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম শাক্ত-তান্ত্রিক ধ্যানধারণার দ্বারা

প্রভাবিত হয়েছিল। এই ধারণাগুলো বিভিন্ন ধর্মকে প্রভাবিত করেই ফুরিয়ে যায় নি, গুপ্তোত্তর যুগে নতুনভাবে আবির্ভূতও হয়েছিল।

নয়. চক্রাবর্তন : সাংখ্য-তন্ত্র সম্পর্ক নিরূপণ

অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাঁহার ছায়া
পরাৎপর পরমাপ্রকৃতি।
অনিবার্য্য নিরুপমা আপনি আপন সমা
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আকৃতি॥
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান অকর্ণ শুনিতে পান
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি
সবে দেন সুমতি কুমতি॥

যিনি অন্নপূর্ণা তিনিই অন্নদা, তিনিই প্রকৃতি বা পরমাপ্রকৃতি। অন্নদামঙ্গল-এর 'গীতারম্ভ' পর্বে অন্নদার পূর্বপূর্ব পরিচয়ের বিবিধ প্রসঙ্গের কথা বলতে গিয়ে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বলেছেন—

বিনা চন্দ্রানল রবি প্রকাশি আপন ছবি
অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত কারণ জলে বসি স্থল বিনা স্থলে
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা॥
গুণসত্ত্ব তমোরজে হরিহর কমলজে
কহিলেন তপ তপ তপ।
শুনি বিধি হরি হর তিন জনে পরস্পর
করেন কারণ জলে জপা॥
তিনের জানিতে সত্ত্ব জানাইতে নিজ তত্ত্ব
শবরূপা হইলা কপটে।
পচাগন্ধ মাংস গলে ভাসিয়া কারণ জলে
আগে গেলা বিষ্ণুর নিকটে॥
পচা গন্ধে ব্যস্ত হরি উঠি গেলা ঘৃণা করি
বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা।
পচা গন্ধে ভাবি দুখ ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ
চারি মুখ হইলা বিধাতা॥
বিধির বুঝিয়া সত্ত্ব শিবের জানিতে তত্ত্ব
শিব অঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া।
শিব জ্ঞানী ঘৃণা নাই বসিতে হইল ঠাঁই

যত্নে ধরি বসিলা চাপিয়া॥
দেখিয়া শিবের কর্ম্ম তাহাতে পশিলা মর্ম্ম
ভার্য্যারূপা ভবানী হইলা।
পতিরূপে পশুপতি দুজনে ভুঞ্জিয়া রতি
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা॥

তান্ত্রিক ধ্যানধারণার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো এটি নারীপ্রধান বা শক্তিপ্রধান বা দেবীপ্রধান। কৃষিকাজ মেয়েদের আবিষ্কার, তাই কৃষি-আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়ের ধ্যানধারণা অনিবার্যভাবেই নারীপ্রধান। তন্ত্র ও বেদ পরস্পর বিরুদ্ধ মত। তাই তন্ত্র নারীপ্রধান, বেদ পুরুষপ্রধান। বেদে নারী আদর্শে ও আচার-অনুষ্ঠানে গৌণ, কার্যত নারী অনধিকারী। তন্ত্র ঠিক বিপরীত। জাত-জাতি এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বেশেষে সবাই তন্ত্রমতের আদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠানের অধিকারী। নারী ও শূদ্রের অধিকারের বিষয়ে বেদাচারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তন্ত্রে এমন নিষেধাজ্ঞা অনুমোদিত নয়। শাক্তমতে, মায়া থেকেই জগতের জন্ম, তাই তাকে জগদম্বা বলা হয়। শাক্তরা মেয়েদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে, মেয়েদের প্রকৃতি উল্লেখ করে। মেয়েদের প্রতি দুর্ব্যবহার শাক্তদের কাছে প্রকৃতির বিরুদ্ধেই অপরাধবিশেষ। মেয়েরা আদি কারণের প্রতীক, তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করলে প্রকৃতি ক্রুদ্ধ হয়, তাদের উপাসনা করলে প্রকৃতি প্রসন্ন হয়। সতীদাহ প্রথার কারণে এ দেশে যখন নারীরা নির্যাতনের শিকার হতো, তখন মহানির্বাণতন্ত্রে এ কাজকে গর্হিত বলা হয়েছে। সকল শাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারেই মেয়েদের পক্ষে গুরু হওয়া সম্ভব; এমনকি তাদের কাছে দীক্ষা নেওয়াই উত্তম। বিপরীতে বৈদিক ঐতিহ্যের পুরুষপ্রাধান্য চূড়ান্ত নারীবিদ্বেষী চরিত্র ধারণ করেছিল। বৈদান্তিক শঙ্করাচার্যের ফতোয়া—নারী নরকের দ্বার। পরবর্তীকালে তান্ত্রিক আচারও যে বিকৃত দশায় পড়ে নি তা বলা যায় না। আবার তন্ত্র যেহেতু মুখ্যত শিবের মুখের কথা, অতএব এতে পুরুষের ভূমিকা একেবারেই নেই একথাও বলা যায় না। তবে উৎপত্তিগতভাবেই এটি নারীপ্রধান এবং গোড়ায় এ সাধনা একান্তভাবেই নারীর এক্তিয়ারে ছিল। আচারভেদ তন্ত্রে বলা হয়েছে, বামা ভূত্বা যজেৎ পরাম্। অর্থাৎ পরাশক্তিকে বামারূপে পূজা করতে হবে। গোটা তন্ত্রেরই প্রধানতম কথা এটি। একজন নিষ্ঠাবান শাক্ত কামনা করে, সে ত্রিপুরাসুন্দরীর সঙ্গে অদ্বৈতভাব স্থাপন করবে, নিজেকে নারীজ্ঞান করার অভ্যাস করবে। শাক্তমতে নারীত্বই সকলের আদর্শ।

তন্ত্রসাধনা আদিতে নারীদেরই সাধনপদ্ধতি ছিল, নারীরূপে সাধনার চেষ্টা তারই স্মারক। কৃষিকেন্দ্রিক জাদু অনুষ্ঠান থেকেই পরবর্তীকালের নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে। কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান থেকে উদ্ভূত বলেই আদিতে এসব সম্প্রদায় নারীদের গুহ্যসম্প্রদায় ছিল মাত্র। পরে এসবে পুরুষের প্রবেশ ঘটেছে, তারা প্রাধান্যও পেয়েছে।

তন্ত্রের সাধনপদ্ধতি এবং তন্ত্রের দেহতত্ত্ব একই সূত্রে গাঁথা। তন্ত্রের দেহতত্ত্বের মূলকথা হলো, মানবদেহকে বিশ্লেষণ করে, মানবদেহ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করেই বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যকেও বোঝা যাবে। কারণ মানবদেহের রহস্য আর বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য সমজাতীয়। উভয়ের মধ্যে কোনো গুণগত

পার্থক্য নেই— যাহা আছে দেহভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে। তন্ত্রের প্রায় সব সাধনা-আরাধনার দুটো দিক— একটি বাইরের তথা বিশ্বতত্ত্বের দিক, আরেকটি ভেতরের তথা দেহতত্ত্বের দিক। তন্ত্রসাধনার মূল হলো দেহতত্ত্ব। তন্ত্রসাধনায় বামাচারই সবচেয়ে কুলীন আচার। বামাচারকে কামাচারও ভাবা হয়, যদিও পুরোটা তা নয়। বামা মানে নারী, নারীর আচার বলেই তা বামাচার। বৈদিক আচার পুরুষপ্রধান, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের কাছে বামাচার বেদবিরোধী আচার।

তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয়েছে, যে পদ্ধতি অনুসারে নরনারীর সংযোগে নতুন জীবের সৃষ্টি হয়, সেই পদ্ধতি অনুসারেই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগে বিশ্বসংসারের উদ্ভব। নরের প্রভাবে নতুন জীবে আমিত্বের বোধ ফুটে ওঠে, আর নারীর প্রভাবে দেহের নাম ও রূপ সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির পূর্বে পুরুষ ও মূলা-প্রকৃতির মধ্যে একটা স্পন্দন বা কম্পনের ভাব অনুভূত হয়। এই স্পন্দনের জন্যই পুরুষ-প্রকৃতির মধ্যে বিয়োগ ও মিলন ঘটে। মিলনের ফলে বিন্দুর সৃষ্টি বা পতন। সেই বিন্দুর মধ্যে সৃষ্টির লীলা চলতে থাকে, সেই লীলার ফলেই বিশ্বের বিকাশ। বিন্দুতে বিলাস করে মহামায়া সৃষ্টি করেন বলে তার নাম বিন্দুবিলাসিনী। মহাকাশে যা স্পন্দন, নর-নারীর মধ্যে তা কাম ও মদনের লীলাখেলা। কোনো কোনো তন্ত্রে বিশ্বসৃষ্টির জন্য শিব-শক্তির এবং জীবসৃষ্টির জন্য নর-নারীর মিলনের একতার কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

চৈতন্য যে মস্তিষ্কেরই একটি স্নায়বিক ক্রিয়া, একথা সর্বপ্রথম তান্ত্রিকেরাই আবিষ্কার করেছেন। তান্ত্রিক মতে মানবদেহ ব্রহ্মাণ্ডের মতোই প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় উপাদান দিয়ে সৃষ্ট। সাংখ্যকারিকায় বলা হয়েছে, স্ত্রী ও পুরুষের (নর ও নারীর) সংযোগে যেমন সন্তানোৎপত্তি হয়, তেমনি প্রধান-পুরুষ (প্রকৃতি-পুরুষ) সংযোগে বিশ্বসৃষ্টি হয়। আদিতে তন্ত্র ও সাংখ্য সমগোত্রীয় ছিল বলেই ধারণা করা যায়। সাংখ্যের মতোই প্রকৃতি আর পুরুষ নিয়েই তন্ত্রের তত্ত্ব। সম্প্রদায়ভেদে পুরুষ ও প্রকৃতির নাম শিব ও শক্তি, রতি ও রস, প্রজ্ঞা ও উপায়। তন্ত্রের মতো সাংখ্য দর্শনেও প্রকৃতিই প্রধান। পুরুষ নেহাতই অপ্রধান এবং উদাসীন। আদিপর্বে সাংখ্যের পুরুষ বলতে আত্মা বোঝাত না, পুরুষকে অর্থাৎ নরকেই বোঝাত। সাংখ্য দর্শনে মাতৃপ্রাধান্যমূলক চেতনার পরিচয় রয়েছে। যে ধ্যানধারণাগুলোকে ব্যাপক অর্থে তান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া হয়, সাংখ্য সেসবেরই দার্শনিক সংস্করণকে বোঝাত।

চরকের মতে, প্রকৃতির অব্যক্ত অংশটির নাম পুরুষ। প্রকৃতির যেটা বিকার বা পরিণামের দিক তার নাম ক্ষেত্র, আর প্রকৃতির যেটা অব্যক্ত দিক তার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। অব্যক্ত ও চেতনা একই বিষয়। এই চেতনা বা অব্যক্ত-প্রকৃতি থেকে বুদ্ধি, বুদ্ধি থেকে অহংকার, অহংকার থেকে পঞ্চভূত এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি; সেই উৎপত্তিকেই সৃষ্টি বলা হয়। তন্ত্র, যোগ, সাংখ্য এবং ব্যাপক অর্থে লোকায়তিক ধ্যানধারণা— সবার উৎস কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস এবং জাদু-অনুষ্ঠান। অন্নপূর্ণা, শাকম্ভরী, ভগবতী— সবাই সাংখ্যের প্রকৃতি। সাংখ্যের প্রকৃতিতত্ত্বকে ঠিকমতো বুঝতে হলে সমাজ বিকাশের এমন এক স্তরে ফিরে তাকাতে হবে যে স্তরে নারীদের ভূমিকা মুখ্য এবং যে স্তরে মানুষের ধ্যানধারণায় নারীর উৎপাদিকা শক্তি আর প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি একই সূত্রে বাঁধা এবং পরস্পরের ওপর প্রভাব

বিস্তারকারী হিসেবে বিবেচিত ছিল। ওই স্তরে পুরুষের ভূমিকা গৌণই ছিল, নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার ফল তো একথাই বলে। তাই বলে প্রজননে তার ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় ছিল না।

সাংখ্য মতে, প্রকৃতির পরিণামের ফলেই জগতের সৃষ্টি। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহংকারতত্ত্ব। অহংকারের পরিণাম পঞ্চ তন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয়। পঞ্চ তন্মাত্রের পরিণাম পঞ্চ মহাভূত। সৃষ্টি দুই রকম— সমষ্টি ও ব্যষ্টি। প্রথমে সমষ্টি সৃষ্টি, পরে ব্যষ্টি সৃষ্টি। সমষ্টি সৃষ্টিতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য থাকে। ব্যষ্টি সৃষ্টিতে রজঃ ও তমঃ গুণের প্রাধান্য দেখা দেয়। প্রকৃতির তিন গুণ— সত্ত্ব, রজঃ তমঃ। প্রকৃতির পরিণামে এই তিন গুণের সঞ্চার হয়। মহত্তত্ত্বে বিরাজমান তিন গুণকে পুরাণে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বলা হয়েছে। এর মানে হলো প্রকৃতি থেকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের জন্ম। কিন্তু প্রকৃতির জগৎসৃষ্টিতে চৈতন্যস্বরূপ সহায়ক এক সত্তার প্রয়োজন পড়ে, তার নাম পুরুষ। পুরাণের 'সৃষ্টিকর্তা' এবং অন্যান্য শাস্ত্রের 'ঈশ্বর' সমষ্টিগত মহত্তত্ত্বেরই একটি স্বরূপ। জ্ঞানের আবির্ভাব মহত্তত্ত্বের আরেক লক্ষণ। তবে পুরুষবাচক কোনো কর্তা বুদ্ধির (বা জ্ঞানের) জোরে জগৎসৃষ্টি করেছেন— সাংখ্য দর্শন এটা স্বীকার করে না।

সৃষ্টির মূলে শক্তি, তথা নারী তথা প্রকৃতি। এখানেই তান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে সাংখ্যের প্রকৃতির সম্পর্ক। তান্ত্রিক বিশ্বাসে নারী আদিপ্রকৃতির জীবন্ত প্রতিরূপ। প্রকৃতি সৃষ্টির কারণ। জগতের উদ্ভব তারই কারণে। সৃষ্টির অত্যাবশ্যকীয় সহযোগী হলো পুরুষ। তন্ত্রে প্রকৃতির নাম শক্তি, পুরুষের নাম শিব। তবে সৃষ্টির মূল তাড়না শিবের তথা পুরুষের নয়। সব পদার্থের অন্তর্নিহিত বিষয় হচ্ছে শক্তি, যা কুণ্ডলিনীরূপে জীবে অবস্থান করে।

পুরুষ ও প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট না হলে সৃষ্টি হয় না। সাংখ্যমতে সৃষ্টিকে বলা হয় সর্গ। সর্গ দুই রকমের— প্রত্যয়সর্গ বা বুদ্ধিসর্গ এবং তন্মাত্রসর্গ বা ভৌতিকসর্গ। প্রত্যয়সর্গ বা বুদ্ধিসর্গের আওতাভুক্ত হলো মহৎ, অহংকার, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও উভয়েন্দ্রিয় মন— মোট তেরোটি পরিণাম। আর তন্মাত্রসর্গ বা ভৌতিকসর্গের আওতায় পড়ে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত এবং মহাভূত থেকে উৎপন্ন সকল দ্রব্য। সৃষ্টি বলতে প্রলয়ের পর প্রথম সৃষ্টিকে বোঝায়। সৃষ্টির পরে প্রলয় হয় এবং প্রলয়ের পর সৃষ্টি হয়। এভাবে অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। সাংখ্য মতে, উৎপত্তি নতুন কোনো সৃষ্টি নয়, কেবল অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়া। আবার বিনাশ কখনোই পরিপূর্ণ বিনাশ নয়, কেবল ব্যক্তের অব্যক্তে বিলীন হওয়া। প্রকৃতির জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য দুটি : পুরুষের ভোগ এবং পুরুষের মুক্তি।

দশ. উপসংহার : শেষ হয়েও হয় না শেষ

কোনো বিষয়ে, বিশেষ করে ধর্মের বিষয়ে বিশ্বাসী ও গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তর তফাৎ রয়েছে; তবে কখনো কোনো প্রসঙ্গে উভয়ের সিদ্ধান্ত এক হতে পারে। এ নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় পুরুষ ও প্রকৃতি এবং এদের আন্তঃসম্পর্ক। পুরুষ ও প্রকৃতির বাস্তব অবয়ব (শরীরী উপস্থিতি) রয়েছে— জীবরূপে প্রথম সত্তা নর এবং দ্বিতীয় সত্তা নারী। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষ ও প্রকৃতির তত্ত্বীয় উপস্থিতিও

(ধর্মে ও দর্শনে) রয়েছে। দর্শনে তারা পুরুষ ও প্রকৃতি; ধর্মে তারা মহাদেব (পরমপুরুষ, শিব) ও মহাদেবী (পরমাপ্রকৃতি, শক্তি)।

কোনো বিষয়ে যিনি বিশ্বাস করেন এবং অভীষ্টলাভের উদ্দেশে কায়মনে চর্চা করেন তিনি সাধক। তত্ত্ব-সন্ধানে নিবিষ্ট ব্যক্তিকেও সাধক বলা যায়। যাই হোক, সাধক তার আরাধ্য-আরাধ্যাকে যে রূপেই গ্রহণ করুন না কেন, দেবী-কল্পনায় শেষ পর্যন্ত তিনি এক অদ্বিতীয়া সনাতনী রূপকেই দেখতে পান। গবেষকের বা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির দৃষ্টি কিছুটা ভিন্ন। দর্শনের (বিশেষ করে ধর্মদর্শনের) গবেষক এক তত্ত্বকে দেশ-কালের বিভিন্ন অবস্থানে ভেঙে ভেঙে দেখতে চান, বুঝতে চান— বহু একত্রিত হয়ে কী করে এক হলো। আর এক কী করে বহু হলো, সাধক এই রহস্য উপলব্ধি করতে চান।

ভারতবর্ষের দেবীতন্ত্রের মূলে এক দেবী ছিলেন; সেই দেবী থেকেই বহু দেবী, বহু পূজাবিধি ও উপাখ্যানের সৃষ্টি হয়েছে— এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়; বরং বহু স্পষ্ট-অস্পষ্ট উৎসমূল থেকে আবির্ভূত বহু দেবী এবং তাদের অবলম্বন করে গড়ে ওঠা বহু পূজাবিধি, বহু উপাখ্যান ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে এক ধারায় সম্মিলিত হয়েছে। সকলকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এক মহাদেবী। একীকরণের এই প্রক্রিয়া চলমান। বৈষ্ণব-দর্শন, শৈব-দর্শন ও শাক্ত-দর্শনকে অবলম্বন করে এক আদিভূতা সনাতনীর ধারণা যতই স্পষ্ট এবং দৃঢ় হয়ে উঠেছে, তত্ত্বব্যাখ্যা ও উপাখ্যান-সৃষ্টির মাধ্যমে ততই বিভিন্ন দেবীসত্তার সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

একান্ন পীঠের একান্ন দেবী মূলে হয়ত স্থানীয় দেবীরূপে একান্নজনই ছিলেন। বিষ্ণু মহাদেবী সতীর মৃতদেহকে শিবের অজ্ঞাতে একান্ন খণ্ডে ভাগ করে একান্ন পীঠে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন— এ উপাখ্যান সৃষ্টি করে একান্ন পীঠের একান্ন দেবীকে এক করার চেষ্টা করা হয়েছে। একান্ন দেবীকে একদেবীর অংশ করে নেওয়ার এই প্রক্রিয়ায় তারা সবাই অভিন্না হয়ে উঠলেন। কারণ নিত্য এবং পূর্ণের অংশও নিত্য ও পূর্ণ। দশমহাবিদ্যার দশ দেবী মূলত দশ দেবীই। সতীর পিত্রালয়ে যাওয়ার উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে পৃথক দশ দেবী এক মহাদেবীর দশ অবস্থা হয়ে উঠেছেন। দশমহাবিদ্যার কোনো কোনো দেবী সম্ভবত আদিম অধিবাসীদের সামাজিক স্তর পেরিয়ে পুরাণ-তন্ত্রাদির মারফত ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্থান করে নিয়েছেন। দার্শনিক শক্তিতত্ত্বের ক্রমবিকাশের ফলে এ উপলব্ধি জাগল যে, শক্তি মূলে এক, তা দুই, তিন বা বহু নয়। তখন শক্তি-প্রতিমূর্তি দেবীরাও সবাই এক হয়ে উঠতে লাগলেন। ক্রমে এ তত্ত্বদৃষ্টি গড়ে উঠল যে, পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলে যে কোনো যুগে যে কোনো সমাজবিধির ভিতরেই কোনো দেবীর উদ্ভব হয়ে থাকুক না কেন, তারা শক্তিরূপিণী এক সনাতনী মহাদেবীরই অংশ বা রূপভেদ মাত্র।

অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ভাষ্যে— 'শাক্তধর্মের মূল ভিত্তি ছিল জনজীবনের নীচের তলা, কৃষিজীবী, কারিগর প্রভৃতি নিয়েই যা গঠিত। এই ধর্মের গুরুরাও ছিলেন নিম্নবর্ণের মানুষ। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণরাও এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁদের বিদ্যাবত্তার জোরে সহজেই নেতৃত্ব অধিকার করেন। ধর্ম ও দর্শনের মূল আদর্শসমূহ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্বও স্বাভাবিকভাবে তাঁদের হাতে এসে পড়ে, কিন্তু তার ফলে বিপদ হয় এই যে, শাক্তধর্ম ও তন্ত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদের স্পর্শ লাগে এবং তারই প্রভাবে শাক্তধর্ম ও তন্ত্র তার কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। ব্রাহ্মণ দার্শনিকেরা সাংখ্যকে

একেবারে পরিত্যাগ করেন নি, কিন্তু তারা সাংখ্যের ওপরও কারিকুরি করে তাকে প্রচ্ছন্ন বেদান্তে পরিণত করেছিলেন। সাংখ্যের পুরুষের ধারণাটাকে একেবারে বদলে সেখানে তাঁরা ব্রহ্মকে বসিয়েছিলেন, যার সঙ্গে তাঁরা সমীকরণ করেছিলেন শিবের। প্রকৃতিকেও তাঁরা স্বধর্ম বিচ্যুত করে ওই ব্রহ্মেরই বিমর্শ শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন।'

দেবী যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া, ত্রৈগুণ্যে স্থিত ওঙ্কার। তিনি সর্বজগতের সৃজন, পালন ও সংহারের কর্ত্রী। তিনি আদি প্রকৃতি, লক্ষ্মী, হ্রী, ঈশ্বরী ও নিশ্চায়ক বুদ্ধি। তিনি বিশ্বরূপিণী এবং সকল চেতন ও অচেতন বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি। তাঁর আরেক নাম বা প্রকাশ মহালক্ষ্মী, এ রূপে তাঁর সত্ত্ব রজঃ ও তম গুণ তিনটিই প্রকটিত। প্রলয়কালে মহালক্ষ্মীর যে তমোগুণান্বিত রূপ প্রকট হয় তার নাম মহাকালী (মহামায়া, মহামারী, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা বা যোগনিদ্রা, কালরাত্রি প্রভৃতি নামেও পরিচিত)। সত্ত্বগুণান্বিতা মহাসরস্বতী মহালক্ষ্মীর আরেক প্রকাশ (তাঁর বিভিন্ন নাম, যথা মহাবিদ্যা, মহাবাণী, ভারতী, বাক, আর্যা, ব্রাহ্মী, বেদগর্ভা ইত্যাদি)। দেবীর এই তিন রূপ থেকে ব্রহ্মা ও শ্রী, রুদ্র ও ত্রয়ী (বেদবিদ্যা) এবং বিষ্ণু ও গৌরী উদ্ভূত হয়েছিলেন। শিবই সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ এবং অশেষ ও অদ্ভূত ক্রিয়াত্মিকা দেবীই প্রকৃতি। দেবী অণুতে ও মহতে যুগপৎ বিরাজ করেন এবং মানবদেহে কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে মূলাধার চক্রে সুপ্ত থাকেন। কুণ্ডলিনী শক্তিকে যোগ ও যম-নিয়মাবলির চর্চার মাধ্যমে জাগরিত করতে হয়। একে বলে চক্রভেদ সাধনা। চক্র ছয়টি। যার ষট্‌চক্রভেদ হয় তিনি আনন্দময়ী দেবীর সাক্ষাৎ পান। এটাই তাঁর সিদ্ধি, দিব্যজ্ঞান ও মোক্ষলাভ। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় অভেদজ্ঞানই দিব্যজ্ঞান।

শিব জ্যোতি বা প্রকাশরূপে শক্তির মধ্যে অনুপ্রবেশকালে বিন্দুরূপ ধারণ করেন। শিব-শক্তির মিলন-ফলের নাম কামকলা। বিন্দুই জগৎপ্রপঞ্চের উপাদানীভূত কারণ; নাদ বা শব্দ থেকে পদার্থাদির নাম হয়। কামকলা থেকে সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ, বাক্য ও অর্থাদির বিকাশ হয়। শিব বর্ণমালার আদি বর্ণ 'অ', এবং শক্তি শেষ বর্ণ 'হ'; এই দুইবর্ণের বা শিব-শক্তির সম্মিলিত দশার মধ্যে 'অহম্' অর্থাৎ অহংজ্ঞান অবস্থান করে, যার প্রকাশ শব্দে অর্থাৎ ভাষায়। আদি ও অন্ত্যবর্ণ অন্যান্য বর্ণ এবং সমগ্র বাক্যের ধারক। শক্তির দুটি অবস্থা— নিষ্ক্রিয় এবং ক্রিয়াশীল। শক্তি যখন জাগ্রত হন তখন শিবও চেতন হন। তখন আত্মজ্ঞান অহমরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সমগ্র বিশ্বজগৎ এই অহমে প্রতিফলিত হয়।

শাক্ত-তন্ত্র একটি সুপ্রাচীন অন্তঃস্রোত, যার মধ্যে বহুরকমের উপাদান বর্তমান। তন্ত্রের ভাববাদী রূপান্তরকরণ আদি-মধ্য ও মধ্যযুগে শুরু, যখন বৈদান্তিকরা তন্ত্র ও শাক্তধর্মকে ব্যবহার করতে শুরু করেন। তার আগে তন্ত্র মূলত বস্তুবাদী ও লোকায়তিক চরিত্রের ছিল, যার অন্যতম উপাদান দেহাত্মবাদ বা দেহতত্ত্ব। আদিম জাদুবিশ্বাসমূলক নানা উপাদানও তন্ত্রে বর্তমান। তান্ত্রিক যৌনাচার এসব আদিম উপাদানের অভিব্যক্তি। জাদুবিশ্বাসের অপরিহার্য শব্দ ও ধ্বনিগত কলাকৌশল তান্ত্রিক মন্ত্রগুলোর রহস্যময়তায় বর্তমান। শব্দ, বীজ, নাদ, বিন্দু, বর্ণ, অক্ষর— এসব তান্ত্রিক পরিভাষার উৎস সম্ভবত ওই আদিম জীবনচর্যা।

বাংলা অঞ্চল আর্য-অধ্যুষিত নয়; সমাজদেহে আর্যরক্তের উপস্থিতি বেশি নয়। এ কারণেই হয়ত এ দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বৈদিক আর্যপ্রভাব ব্যাপক নয়। বাংলা অঞ্চলের জনসমাজে পুরাকাল থেকে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্য। একটি দৃঢ়বদ্ধ বিশ্বাসকে অবলম্বন করে বহুদিন ধরে কোনো জাতির মধ্যে যখন একটি ধর্মমত গড়ে উঠতে থাকে তখন একটি-দুইটি থাকে মুখ্য ধারা, তার সঙ্গে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন উৎস থেকে নানা ধারা এসে তাকে পুষ্ট করে। সমন্বয় চলতে থাকে। অনেক অনেক দিন পরে কোনটি মূলধারা, আর কোনগুলো উপধারা তা চেনা কঠিন। শাক্তসাহিত্যের মধ্যে উমাকে পাওয়া যায়, তিনিই পার্বতী গিরিজা। দক্ষকন্যা সতীই দশমহাবিদ্যারূপে রূপান্তরিত। একান্ন মহাপীঠে তার একান্ন দেহাংশ অবলম্বনে একান্ন দেবী। সেখানে যে অসুরনাশিনী চণ্ডীকে পাওয়া যায়, তিনিই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, অভয়দায়িনী অভয়া, মঙ্গলকারিণী সর্বমঙ্গলা। আর পাওয়া যায় কালিকা বা কালী দেবীকে; শাক্ত সাধকদের তিনিই প্রধান আরাধ্যা। পুরাণ-তন্ত্রাদির মধ্যে একই মূল দেবীর সঙ্গে অভিন্নরূপে দেবীর আরো অনেক রূপ লুকিয়ে আছে। মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি আঞ্চলিক দেবীরাও মূল দেবীর সঙ্গে অভিন্না। বিদ্যারূপিণী সরস্বতী ও শ্রী এবং সম্পদরূপিণী লক্ষ্মীও তিনিই। জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী প্রভৃতি দেবী মূলদেবীর রূপভেদ হিসেবে গৃহীত। সাহিত্যে অনুল্লিখিত বহু পুজ্য দেবীও স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে বহু হলেও তারা মূলত এক; দ্বিতীয়রহিত সনাতনী মহাদেবী থেকে উদ্ভূত।

শাক্ত সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী স্বয়ং আদ্যাশক্তিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রতীকস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেন। আদিম চেতনায় নারী শুধু উৎপাদনের প্রতীক নয়, সত্যকারের জীবনদায়িনীর ভূমিকাও তারই। সামাজিক বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরগুলোতে মাতৃত্বের ভূমিকাই ছিল প্রধান, জীবনদায়িনী মাতৃদেবীই ছিল ধর্মজীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এই নারীশক্তির সঙ্গে পৃথিবীর, মানবীয় ফলপ্রসূতার সঙ্গে প্রাকৃতিক ফলপ্রসূতার সমীকরণ সাংখ্য ও তন্ত্রোক্ত প্রকৃতির ধারণার উদ্ভবের কারণ।

পরমা প্রকৃতিই সতী। দক্ষের ঘরে তাঁর নবজন্ম। নতুন বিশ্বসংসারে তাঁর 'অপর' (আদার হাফ) শিব তথা পুরুষ সম্ভবত পূর্বস্মৃতি ভুলে গিয়েছিলেন। তাই সতীর দশরূপ দেখে দিশেহারা হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ফাঁপর-দশা সতীকে ভাবিত করেছিল। পুরুষ-প্রকৃতি সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। প্রচীন দার্শনিকদের তা-ই অভিমত। এ কারণেই হয়ত কালীরূপী সতী শিবকে স্মরণ করিয়ে দিলেন পুরোনো সেই দিনের কথা—

কালীমূর্ত্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে। পূর্ব্ব সর্ব্ব জান কেন পাসরিলা এবে॥
পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে। প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে॥
তিন জনে তোমরা কারণজলে ছিলা। তপ তপ তপ বাক্য কহিনু শুনিলা॥
তিন জনে পরস্পরে লাগিলা জপিতে। শবরূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে॥
পচাগন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভাবি দুখ। বিধি হৈলা চতুর্মুখ ফিরি ফিরি মুখ॥
তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন। প্রকৃতি রূপেতে তোমা করিনু ভজন॥
পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে। সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে॥

সাইফ তারিক সহকারী বার্তা সম্পাদক, দৈনিক কালের কণ্ঠ। tarik69@gmail.com

পাঠ-পর্যালোচনার সূত্র-নির্দেশিকা

- দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।
- প্রাগুক্ত, ভারতীয় দর্শন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২।
- অক্ষয় কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (প্রথম ভাগ), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, জৈষ্ঠ ১৪২২।
- শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, অষ্টম মুদ্রণ, কার্তিক ১৪১৬।
- নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি : প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, জুন ২০১৫।
- সুখময় ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ), তন্ত্র পরিচয়, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪।
- ড. অতুল সুর, ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০১৪।
- প্রাগুক্ত, হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য, সাহিত্যলোক, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২।
- কঙ্কর সিংহ, ধর্ম ও নারী : প্রাচীন ভারত, র‍্যাডিকেল ইমপ্রেশন, কলকাতা, তৃতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭।
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর, অন্নদামঙ্গল (প্রথম খণ্ড), সম্পাদনা তরুণ মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০০৫। (কোনো কোনো অংশের জন্য অন্নদামঙ্গল-এর উইকিসংকলনভুক্ত পাঠকে মিলিয়ে পড়া হয়েছে)।
- সাংখ্যদর্শনের বিবরণ, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য (সপ্ততীর্থ), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০০৮/বি।
- শ্রীমৎ স্বামী অচ্যুতানন্দ পুরী মহারাজ, ঋষিশিল্পে শ্রীশ্রী দশমহাবিদ্যা (http://tulshidhamctg.blogspot.com/p/blog-page_24.html)
- রণদীপম বসু, সাংখ্য দর্শন (https://horoppa.wordpress.com/2012/12/01/5661-samkhya-philosophy-/)
- প্রাগুক্ত, তন্ত্র-সাধনা (https://horoppa.wordpress.com/2017/10/16/tantra-sadhona-01-introduction/)
- http://www.amkmission1941.com/RqZz-kÖxkÖx-`kgnvwe`&/..
- A.K. Goswami, Adi-shakti: Durga Devi--Genesis of Energy (http://www.yogamag.net/archives/1979/joct79/adishakti.shtml; Magazine of The Bihar School of Yoga)
- Arthur Avalon (Sir John Woodroffe), Shakti and Shâkta--Essays and Addresses on the Shâkta tantrashâstra; London: Luzac & Co., [1918] (Source: http://www.sacred-texts.com/tantra/sas/sastitle.htm)
- Nitin Kumar, Mother Goddess as Kali--The Feminine Force in Indian Art, August 2000 (http://www.exoticindiaart.com/article/kali/)

- Swami Nirvikalpananda Saraswati, Shakti's Sadhana, Magazine of The Bihar School of Yoga (http://www.yogamag.net/archives/1980/joct80/saksad.shtml)
- Shiva & Shakti: All About Tantra (http://www.allabouttantra.info/en/english/66-shiva-shakti)
- Shiva, The Masculine Principle In Tantra (http://www.sivasakti.com/tantra/other-hindu-deities/shiva-the-masculine-principle-in-tantrism/)
- Swami Satyananda Saraswati, Tantra, (delivered) at the Zinal Conference in May 1979 (http://www.yogamag.net/archives/1980/joct80/tan.shtml; Magazine of The Bihar School of Yoga)
- Graham Reid Phoenix, Kali and Tantra – Lessons for Men (http://satpurusha.com/2010/02/kalis-sword-2/)
- Kali as Shakti, (http://www.dakshineswar.com/kali-as-shakti.html)
- Kundalini – The Colossal Cosmic Power (http://www.sivasakti.com/tantra/important-concepts/kundalini-the-colossal-cosmic-power-part-1/)
- Swami Niranjanananda Saraswati, Kundalini Shakti, Ganga Darshan, November 1994 (http://www.yogamag.net/archives/1996/ajan96/kunshak.shtml; Magazine of The Bihar School of Yoga)
- Lalita Tripurasundari, the Red Goddess (http://www.shivashakti.com/tripura.htm)
- The Editors of Encyclopædia Britannica, Purusha: INDIAN PHILOSOPHY
- Purusha, Definition - What does *Purusha* mean? (https://www.yogapedia.com/definition/5336/purusha)
- Sankhya (http://www.iep.utm.edu/sankhya/)
- Samkhya Philosophy (https://academy.gktoday.in/article/samkhya/)
- Swami Nischalananda Saraswati, Shiva & Shakti--the Twin 'Realities' (http://www.yogamag.net/archives/1991/bmar91/twins.shtml; Magazine of The Bihar School of Yoga)